খড় ও মাটি তাপের কুপরিবাহী। সেই কারণে খড়ের চালওয়ালা মাটির বাড়ি গ্রীষ্মকালে যেমন ঠান্ডা, শীতকালে তেমনি গরম।

বরফ তাপের কুপরিবাহী। সেই কারণে ইগলু বরফ দিয়ে তৈরি করা হয়। ইগলুর ভেতরটা বেশ গরম। পুকুরের জলে ডুব দিয়ে যাদের স্নান করার অভিজ্ঞতা আছে তারা জানে গ্রীষ্মকালে পুকুরের জলের ওপরটা যতটা গরম হয় পুকুরের জলের নীচের দিকটা ততটা গরম হয় না।

ইগলু: গ্রিনল্যান্ডের থুলে অঞ্চলের এস্কিমোদের বাসস্থান হিসেবে পরিচিত। ইগলু বরফ দিয়ে তৈরি করা হয়।

আবার শীতকালে ঠিক এর উলটোটা। জল তাপের কুপরিবাহী বলে এইরকম হয়।

● **যে সমস্ত প্রাণীরা জলে থাকে তারা তাহলে গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে জলের কোন স্তরে থাকতে আরাম বোধ করে? জলের ওপরের স্তরে নাকি জলের নীচের স্তরে?**

তাপের পরিচলন

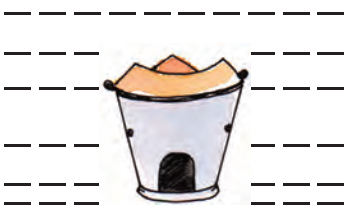

উনুনটি জ্বলছে না। তাই উনুনের চারদিকের সব অংশের বায়ুর ঘনত্ব একই।

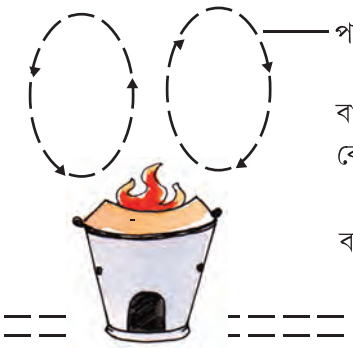

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, জলন্ত উনুনের পাশের দিকে হাত রাখলে যত গরম লাগে উনুনের ওপরের দিকে হাত রাখলে অনেক বেশি গরম লাগে। কেন এমন হয় বলোতো?

উনুনের খুব কাছের বায়ু উনুন থেকে তাপ নিয়ে গরম হয় ও আয়তনে প্রসারিত হয়। ফলে ওই বায়ুর ঘনত্ব কমে যায় ও বায়ু হালকা হয়ে যায়। কিন্তু বেশি ওপরের বায়ুর ঘনত্ব একই থাকে। অর্থাৎ আগুনের কাছ থেকে ওপরের দিকে উঠতে থাকলে বায়ু ভারী হতে থাকবে। ভারী বায়ু পৃথিবীর টানে নীচের দিকে নেমে আসে। অপেক্ষাকৃত গরম ও হালকা বায়ু ওপরের দিকে উঠে গিয়ে সেই জায়গা নেয়। অর্থাৎ বেশি উষ্ণতার বায়ু নিজেই এখানে তাপ বহন করে নিয়ে যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালনের সময় পদার্থের উত্তপ্ত অংশের কণাগুলো নীচের উষ্ণতর অংশ থেকে ওপরের শীতলতর অংশের দিকে নিজেরাই তাপ নিয়ে যায়। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় তাপের সঞ্চালন কোনো বস্তুমাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়। আবার অভিকর্ষহীন স্থানেও সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে তাপ কখনও ওপর থেকে নীচের দিকে বা পাশের দিকে সঞ্চালিত হয় না।

একটি বিকারে কিছুটা জল নিয়ে তার মধ্যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কয়েকটি টুকরো ফেলে দেওয়া হলো। এবার বিকারের যে জায়গায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের টুকরোগুলি আছে সেই স্থানটিকে আস্তে আস্তে গরম করলে বেগুনি রঙের জলের (পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণ) স্রোত কোনদিকে উঠছে লক্ষ করো। তারপর ওই বেগুনি রঙের জল কি আবার নীচের দিকে নামছে?

জলের মধ্যে বেগুনি রঙের জলের স্রোত তাপ ছড়িয়ে পড়ার পরিচলন প্রক্রিয়াটি বুঝতে সাহায্য করছে।

পরিচলন স্রোত : তরল বা গ্যাসের গরম অংশ তুলনামূলকভাবে হালকা বলে ওপরে ওঠে ও ঠান্ডা অংশ ভারী বলে নীচে নামে। এর ফলে তরল বা গ্যাসের মধ্যে যে চক্রাকার স্রোতের সৃষ্টি হয়, তাকে পরিচলন স্রোত বলে।

একটা পাত্রে একটি মোমবাতি লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। পাত্রটিতে কিছুটা জল ঢালা হলো। মোমবাতিটিকে মাঝখানে রেখে একটা চিমনি বসিয়ে দিলে দেখা যাবে মোমবাতিটি নিভে গেল। মোমবাতি ও চিমনির নীচের দিকটায় জল থাকায় কোনো বাতাস প্রবেশ করতে পারেনি। আরো বোঝা যাচ্ছে চিমনির ওপরের ফাঁকা অংশ দিয়েও বাতাস প্রবেশ করেনি। যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন না থাকায় মোমবাতিটি নিভে যাবে। যদি T-এর আকারের টিনের পাত চিমনিটির মুখে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাতে মোমবাতিটি আর নিভে যায় না। T আকারের পাতটি মুখে লাগানোয় তার একদিক দিয়ে ভারী ও ঠান্ডা বায়ু চিমনির মুখে প্রবেশ করবে অপরদিক দিয়ে উত্তপ্ত হালকা বায়ু নির্গত হবে। ফলে বায়ুর একটি পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হবে। সেই জন্য বাতিটি জ্বলতে থাকে।

বায়ুচলন (Ventilation) : আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু ত্যাগ করি তা ঘরের বায়ুর থেকে বেশি উষ্ণ এবং আর্দ্র বলে অপেক্ষাকৃত হালকা হয়। ফলে এই হালকা বায়ু ওপরে উঠে যায়। ঘরের দেয়ালের ওপরের দিকে ঘুলঘুলি বা ফাঁক থাকে। এই ঘুলঘুলি দিয়ে ওই গরম অস্বাস্থ্যকর বায়ু ঘরের বাইরে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের থেকে শীতল বায়ু দরজা বা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যাতে অক্সিজেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। এভাবে পরিচলন স্রোতকে কাজে লাগিয়ে ঘরে বায়ু চলাচল অব্যাহত রাখা হয়। শীতকালে বন্ধ ঘরে হ্যারিকেন বা আগুন জ্বালিয়ে শোয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। বায়ু চলাচলের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে ঘরের ভেতরের অক্সিজেনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কমে যায়। তখন কেরোসিন বা কয়লার দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়াও বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস তৈরি হতে পারে। ফলে নিদ্রিত অবস্থায় ঘরের বাসিন্দাদের মৃত্যু ঘটতে পারে। আবার পরিচলন স্রোত আছে বলেই বায়ুপ্রবাহ হয়। সমুদ্রবায়ু, স্থলবায়ু, বাণিজ্যবায়ু পরিচলন স্রোতের জন্যই সৃষ্টি হয়।

বিকিরণ

একটি জ্বলন্ত মোমবাতি দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। ছবির মতো করে একটি থার্মোমিটারকে মোমবাতির শিখার তলায় ধরা হলো।

থার্মোমিটারের পাঠ কি উষ্ণতার পরিবর্তন দেখাবে?

বায়ু কি তাপের সুপরিবাহী?

তাহলে তাপ কি বায়ু মাধ্যমে পরিবহণ প্রক্রিয়ায় ওই থার্মোমিটারের কুণ্ডটি পর্যন্ত যেতে পারবে?

আবার পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ কোন দিকে যায়?

ওপর থেকে নীচের দিকে না কি নীচ থেকে ওপরের দিকে? তাহলে কি এই পরীক্ষায় তাপ পরিচলন প্রক্রিয়ায় থার্মোমিটারের কুণ্ডটিতে পৌঁছোতে পারবে?

ওপরের আলোচনা অনুযায়ী থার্মোমিটারের কুণ্ডটির উষ্ণতার পরিবর্তন হলো। কিন্তু পরিবহন বা পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ থার্মোমিটারের কুণ্ডে গেল না।

তাহলে তাপ প্রবাহিত হলো কোন প্রক্রিয়ায়?

তাপ প্রবাহিত হবার এই পদ্ধতিকে বলে বিকিরণ। পরিবহণ বা পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ প্রবাহের জন্য মাধ্যমের দরকার হয়। কিন্তু সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে অনেকটা অংশেই কোনো বস্তু মাধ্যম নেই। তাহলে সূর্য থেকে

পৃথিবীতে কোন পদ্ধতিতে তাপ আসে? সেই পদ্ধতির নাম **বিকিরণ**।

শীতকালে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসলেই আমাদের গরম লাগে। বালব জ্বালালে সব দিকেই কি তার তাপ ছড়িয়ে যায়?

এখানে কোন প্রকিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে?

এই তাপ সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে পরিবহণ বলা যাবে না কারণ বায়ু তাপের কুপরিবাহী।

যেহেতু পাশের দিকেও তাপ প্রবাহিত হচ্ছে এবং একই সঙ্গে সবদিকেই তাপ প্রবাহিত হচ্ছে তাই এই ধরনের তাপ সঞ্চালন পরিচলনও নয়। তাহলে এইভাবে তাপপ্রবাহ বিকিরণ প্রকিয়াতেই হয়েছে।

বিকিরণ : যে প্রক্রিয়ায় তাপ উষ্ণবস্তু থেকে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে ও ছড়িয়ে পড়ার জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না তাকে বিকিরণ বলে।

থার্মোফ্লাস্ক

কোনো বস্তুকে একই উষ্ণতায় অনেকক্ষণ রেখে দিতে চাইলে আমরা ওই বস্তুকে থার্মোফ্লাস্কে রাখি। ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার জেমস ডিওয়ার এই ফ্লাস্ক্ উদ্ভাবন করেন। তাই এই ফ্লাস্কের আর এক নাম ডিওয়ার ফ্লাস্ক। ডিওয়ার ফ্লাস্কে ঠান্ডা পানীয় রাখলে তা যেমন অনেকক্ষণ ঠান্ডা থাকে, তেমনি গরম জল রাখলে তা অনেকক্ষণ গরম থাকে।

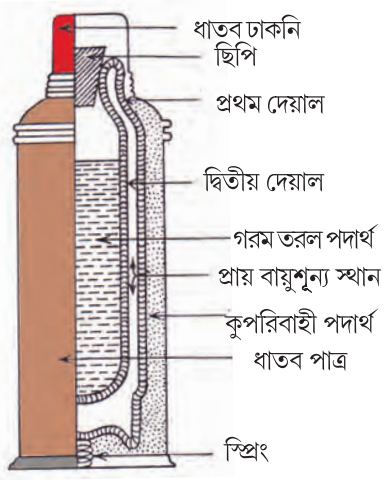

গঠন : এটি দুই দেয়াল বিশিষ্ট একটি কাচের পাত্র। ভেতরের দেয়ালের বাইরের তলে এবং বাইরের দেয়ালের ভেতরের তলে রুপোর প্রলেপ দেওয়া থাকে। ফলে দেয়াল দুটি চকচকে হয়। দেয়ালদুটির মাঝখানে যতদূর সম্ভব কম ভরের বায়ু রাখা হয়। ফ্লাস্কটির মুখ একটি কুপরিবাহী পদার্থের (যেমন কর্ক বা পলিথিন) তৈরি ছিপি দিয়ে বন্ধ করা হয়। যাতে সহজে না ভাঙে তার জন্য পাত্রটিকে স্প্রিং-এর উপর বসিয়ে একটি ধাতব বা প্লাস্টিকের পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। এই পাত্র ও কাচের পাত্রের মাঝের অংশ ফেল্ট, তুলো, গ্লাসউল ইত্যাদি কুপরিবাহী পদার্থ দিয়ে ভরতি থাকে।

কার্যনীতি : পাত্রের কাচ তাপের কুপরিবাহী। পাত্রটির খোলা মুখের ছিপিও তাপের কুপরিবাহী। পাত্রটির কাচ দিয়ে তৈরি অংশটির চারপাশ কুপরিবাহী পদার্থ দিয়ে ঘেরা। ফলে পরিবহণের সাহায্যে তাপ সঞ্চালন ব্যাহত হয়। আবার দুই দেয়ালের মাঝখান প্রায় বায়ুশূন্য থাকায় পরিবহণ ও পরিচলন পদ্ধতিতে পাত্রটির বাইরের তাপ ভেতরে এবং ভেতরের তাপ বাইরে যেতে পারে না। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় বাইরের থেকে তাপ ভেতরে প্রবেশ করার সময় প্রথম দেওয়াল দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। ভেতর থেকে বাইরে যাবার সময় দুই দেয়ালের চকচকে পৃষ্ঠের জন্য পাত্রের ভেতর থেকে তাপ প্রতিফলিত হয়ে পাত্রের মধ্যেই ফিরে যায়। তাপের বিকিরণ অনেক কম হয়। এখানে তাপের এই আচরণ আলোর প্রতিফলন ধর্মের মতো। এভাবে তাপ সঞ্চালনের সমস্ত প্রক্রিয়াই ব্যাহত হয়। ফলে অনেকক্ষণ ধরে ফ্লাস্কে শীতল বস্তু শীতল ও উষ্ণ বস্তু উষ্ণ থাকে।

1.4 আলো

প্রতিবিম্ব

এক মুখ খোলা একটা বাক্স নাও। ছবির মতো করে বাক্সের ভেতর একটা ইরেজার রেখে তা একটা সমতল আয়নার সামনে রাখো। খেয়াল রেখো বাক্সের খোলা মুখ যেন আয়নার দিকে থাকে। এখন বাক্সটার পেছন দিক থেকে কী বাক্সের ভেতরে রাখা ইরেজারটা দেখতে পাচ্ছ? কেন দেখতে পাচ্ছ না? এবার আয়নার দিকে দেখোতো। এখন কি ইরেজারটা দেখতে পাচ্ছ?

তুমি জানো যে, তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ আসলে তা ইরেজারের 'প্রতিবিম্ব'। আর এই প্রতিবিম্বকে কি প্রকৃত ইরেজারের অবস্থানেই দেখতে পাচ্ছ?

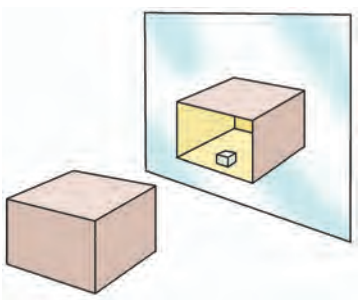

এক্ষেত্রে ইরেজার থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে তোমার চোখে এসে পৌঁছেছে। সরাসরি তোমার চোখে এসে পৌঁছোয়নি।

আবার, খালি বালতিতে জল ঢালার পর বালতির তলদেশ ওপরে উঠে এসেছে মনে হয়। এক্ষেত্রেও বালতির তলদেশ থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ ঘনতর আলোক মাধ্যম জল পেরিয়ে লঘুতর আলোক মাধ্যম বায়ুতে প্রবেশ করে। সেইসময় আলোকরশ্মিগুচ্ছ জল ও বায়ু মাধ্যমের বিভেদতল থেকে গতিপথ পরিবর্তন করে ও নির্দিষ্ট অবস্থানে দর্শকের থাকা চোখে পড়ে। এক্ষেত্রেও আলো সরাসরি চোখে এসে পৌঁছোয় না। ফলে বালতির তলদেশ কিছুটা ওপরে দেখা যায়। এটা বালতির তলদেশের প্রতিবিম্ব। তোমরা জানো এর কারণ হলো আলোর প্রতিসরণ।

তাহলে, দেখা যাচ্ছে কোনো বস্তু থেকে আলোকরশ্মিগুচ্ছ সরাসরি যদি আমাদের চোখে পৌঁছোতে পারে, তখন সেই বস্তুকে আমরা তার নিজের অবস্থানেই দেখতে পাই। কখনো-কখনো বস্তু থেকে আলোকরশ্মিগুচ্ছ সোজাসুজি আমাদের চোখে এসে পৌঁছোয় না। প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে আমাদের চোখে এসে পৌঁছোয়। তখন চোখ আলোকরশ্মিগুচ্ছের এই বাঁকাপথ অনুসরণ করতে পারে না। ফলে আমাদের চোখ অন্য কোনো স্থানে বস্তুর **প্রতিবিম্বকে** দেখে।

তাহলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির পেছনে মূলত দুটি কারণ —

(i) প্রতিফলন ও (ii) প্রতিসরণ।

তুমি আয়নার পেছনে যদি একটা পর্দা রাখো তবে কি আয়নায় সৃষ্ট প্রতিবিম্বকে তুমি পর্দায় দেখতে পাবে? কিন্তু, সিনেমা হলে সিনেমা চালু হলে পর্দার ওপর যা দেখতে পাও তা প্রতিবিম্ব। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব পর্দায় গঠিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কিছু প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় আবার কিছু প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় না।

যে প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় তাকে **সদবিম্ব** বলে। আর যে প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় না তা **অসদবিম্ব**।

তাহলে সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব **অসদবিম্ব**।

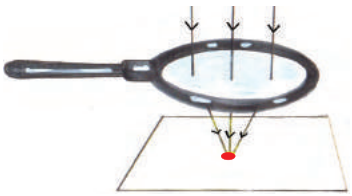

একটা আতস কাচ নাও। এবার রোদের মধ্যে মেঝের ওপরে রাখা একটি সাদা কাগজ থেকে একটু ওপরে ধরো। দেখোতো কাগজটিতে একটা ছোট্ট গোল আলোক চাকতি দেখতে পাচ্ছ কি না? এটাই সূর্যের প্রতিবিম্ব। তাহলে এই প্রতিবিম্ব সদবিম্ব। কারণ তা কাগজের ওপর তৈরি হয়েছে। এখানে কাগজটিই আমাদের 'পর্দা'।

এবারে পাশের চিত্রটি খেয়াল করো।

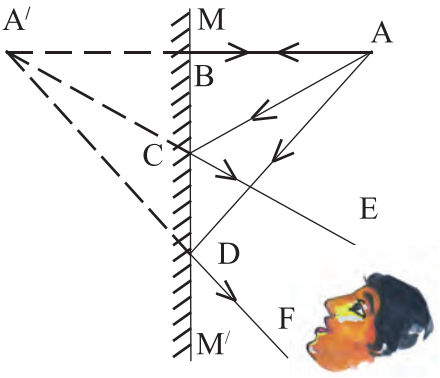

A বিন্দু থেকে আসা আপতিত আলোকরশ্মি AB, MM′ সমতল আয়নাতে প্রতিফলনের পর BA পথ ধরে ফিরে যায়। আবার AC ও AD রশ্মিদুটি প্রতিফলনের পর যথাক্রমে CE ও DF পথ ধরে ফেরত যায়। AB, EC, ও FD কে বর্ধিত করলে তারা A′ বিন্দুতে মিলিত হয়। দর্শকের কাছে তাই মনে হয় A′ বিন্দু থেকেই আলো এসে তার চোখে পড়ছে। A′ হলো A বিন্দুর অসদবিম্ব। কোনো বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হওয়ার পর একটা বিন্দুতে এসে মিলিত হলে, দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর **সদবিম্ব** বলে।

আবার, কোনো বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হওয়ার পর যদি অন্য কোনো একটি বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয়, তখন দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অসদবিম্ব বলে।

একটি স্কেলের 0 (zero) চিহ্নিত দাগে ছবির মতো করে একটা সমতল আয়না বসাও। এবার '5' চিহ্নিত দাগে তোমার পেনের অগ্রভাগটা বসাও।

এবার নীচের সারণিটা পূরণ করো

কোথা থেকে কার দূরত্ব	দূরত্বের পরিমাপ
আয়না থেকে পেনের অগ্রভাগের দূরত্ব	..... cm
আয়না থেকে পেনের প্রতিবিম্বের অগ্রভাগের দূরত্ব	..... cm
পেনের অগ্রভাগ ও তার প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব	..... cm

তাহলে সমতল আয়না থেকে বস্তু ও সমতল আয়না থেকে তার প্রতিবিম্বের দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক কী?

এবার, পেনের অগ্রভাগ আয়না থেকে 3 cm দূরে অর্থাৎ 8cm -এর ঘরে নিয়ে যাও

এখন, দেখোতো পেনের অগ্রভাগ ও আয়নার মধ্যে দূরত্ব কত?

তাহলে বলো, পেনের অগ্রভাগ আয়না থেকে 3 cm দূরে সরালে, পেনের অগ্রভাগ ও তার প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব কতটা বাড়ল?

এবার, আয়নার দিকে পেনের অগ্রভাগ 3 cm এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কমিয়ে পরীক্ষাটি করো।

তাহলে বোঝা গেল, আয়নার থেকে বস্তুর দূরত্ব কমলে বা বাড়লে বস্তু ও প্রতিবিম্বের মধ্যেকার দূরত্ব তার দ্বিগুণ বাড়ে বা কমে।

একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কি নিজের পিছনদিকটা আয়নাতে দেখতে পাও? যদি দেখতে চাও তবে কী করতে হবে?

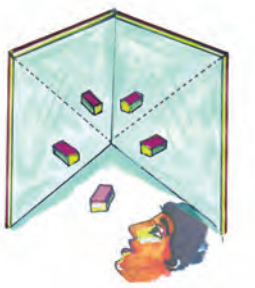

তখন কি আর একটি আয়না দিয়ে তা সম্ভব? তোমরা তো জানো একটি সমতল আয়না শুধু একটি প্রতিবিম্বই গঠন করতে পারে। ভেবে দেখোতো তুমি যখন সেলুনে চুল কাটাও তখন তোমার পেছনেও একটা আয়না থাকে কিনা? এসো এখন আমরা দেখি একসঙ্গে দুটো আয়না ব্যবহার করলে কী হয়।

দুটো সমতল আয়না নাও। ছবির মতো করে একটা সমান টেবিলের ওপর একটা সাদা কাগজ পাতো। ছবির মতো করে কাগজের ওপর একেকবার একেক কোণ করে আয়না দুটোকে বসাও। আয়না দুটোর মাঝে একটি ইরেজার রাখো।

আয়না দুটির মধ্যে কোণ	30^0	60^0	90^0
আয়না দুটিতে গঠিত হওয়া প্রতিবিম্বের সংখ্যা			

এবার আয়না দুটোয় গঠিত হওয়া প্রতিবিম্বগুলো লক্ষ করো। আর ওপরের সারণিটা পূরণ করো।

প্রতিবিম্ব সংখ্যা $= \frac{360}{\text{দর্পণ দুটির মাঝের কোণের মান}} - 1$; সূত্রটির সাহায্যে টেবিলে লেখা ফলগুলি মিলিয়ে দেখো।

এখন আয়নাদুটোকে সামনাসামনি পরস্পরের সমান্তরাল করে একটু ব্যবধানে বসাও। ইরেজারটা আবার আয়না দুটোর মাঝে বসাও। এবার লক্ষ করোতো তুমি ইরেজারের কটা প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছ? প্রতিবিম্বের সংখ্যা গুণে শেষ করা যাচ্ছে কি?

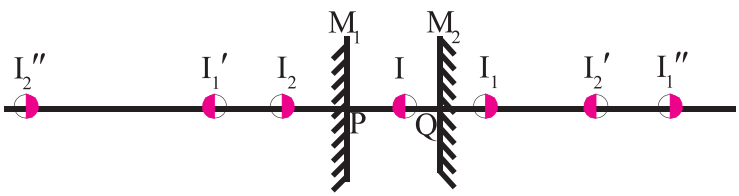

$IQ = QI_1$
$IP = PI_2$
$I_2Q = QI_2'$
$I'_1Q = QI_1''$
$I'_2P = PI_2''$

M_1 ও M_2 সমতল আয়না

I বস্তু

$I_1, I_2', I_1'', I_2'', I_1'$ ও I_2 প্রতিবিম্ব

এবার চলো দেখি ছবি এঁকে প্রতিবিম্ব তৈরির এই ব্যাপারটিকে বোঝা যায় কিনা। তোমরা দেখেছ যে আয়না থেকে বস্তুর দূরত্ব এবং আয়না থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান হয়। নীচের ছবিটিতে আমরা বস্তুর দূরত্ব ও প্রতিবিম্ব দূরত্বের এই সমান হওয়াকে ব্যবহার করেপ্রতিবিম্বগুলো আঁকার চেষ্টা করেছি। দেখোতো এভাবে প্রতিবিম্ব আঁকা কখনও শেষ হয় কিনা।

চলো আয়না নিয়ে একটি মজার খেলনা বানাই।

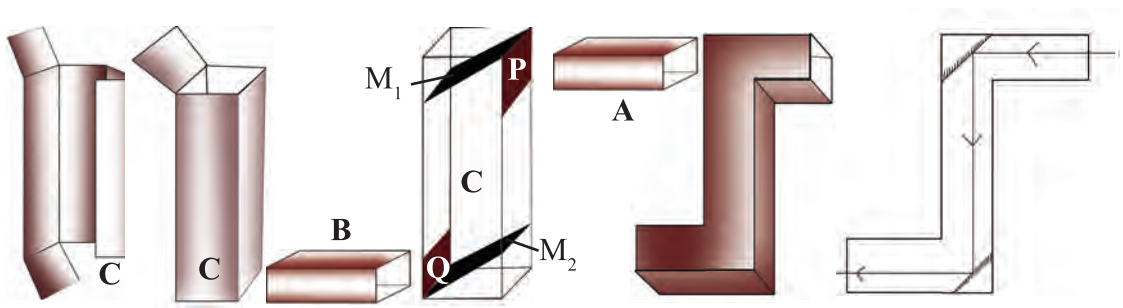

একই প্রস্থচ্ছেদের তিনটি পিচবোর্ডের বাক্স তৈরি করো। দুটি ছোটো (A ও B)। অপরটির (C) দৈর্ঘ্য অন্য দুটির চেয়ে বেশি। C বাক্সটির খোলা দুই মুখে দুটি সমতল আয়না (M_1 ও M_2) পরস্পরের সমান্তরালে বসাও (ছবিতে দেখো)। আয়নাদুটির প্রতিফলক তল (চকচকে তল) পরস্পরের মুখোমুখি থাকবে। এবার খোলা মুখদুটি ঢেকে দাও। বাক্সটি থেকে P ও Q অংশ কেটে নাও। এই অংশের মাপ বাক্সগুলির মুখের মাপের সমান। এবার ওই স্থানে A ও B বাক্সদুটি জুড়ে দাও। — ব্যাস তুমি বানিয়ে ফেলেছ তোমার **পেরিস্কোপ**। এখন একটি সুন্দর রঙিন কাগজ তোমার পেরিস্কোপের গায়ে আটকিয়ে পেরিস্কোপটিকে আকর্ষণীয় করে তোলো।

কোনো বস্তু থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ পেরিস্কোপের প্রথম বাক্সের ভিতর প্রবেশ করলে তা প্রথম আয়নায় (M_1) প্রতিফলিত হয়। ওই প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ দ্বিতীয় আয়নায় (M_2) আবার প্রতিফলিত হয়, তারপর দর্শকের চোখে এসে পড়ে। তখন দর্শক তা দেখতে পায়।

আগেকার দিনে খেলার মাঠের বাইরের দর্শক পেরিস্কোপের সাহায্যে খেলা দেখতো। এছাড়া পেরিস্কোপ ব্যবহার হতো সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক ইত্যাদিতে।

এসো এবার আরো একটি মজার খেলনা বানাই।

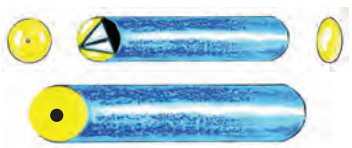

ক্যালেইডোস্কোপ

তিনটে সমান মাপের আয়তাকার সমতল আয়নার টুকরো নাও (দৈর্ঘ্য : প্রস্থ = 4 : 1)। এখন আয়না তিনটের কাচ জোড়া দেওয়ার আঠা দিয়ে প্রিজম আকৃতির করে জোড়া দাও (ছবিতে দেখো)। প্রতিফলক তলগুলো ভেতর দিকে থাকবে। এবার একটা পিচবোর্ড গোল করে (পাইপের মতো করে) প্রিজম আকারটির চারপাশে জড়িয়ে দাও। এরপর একটা ঘষা কাঁচ মাপ মতো গোল করে কেটে যে-কোনো একমুখে লাগিয়ে দাও। কিছু ভাঙা রঙিন চুড়ি, কিছু সুন্দর সুন্দর রঙিন চুমকি, কয়েকটা থার্মোকলের রঙিন বল প্রিজম আকারের গর্তের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। খোলা মুখটিকে এবার একটি পিচবোর্ডের টুকরো দিয়ে বন্ধ করো ও ওই বন্ধ মুখের মাঝখানে একটি ফুটো করে দাও।

এবার, বৃত্তাকার ছিদ্র বাদে পুরোটা একটা সুন্দর রঙিন কাগজ দিয়ে জড়িয়ে নাও। তৈরি হলো তোমার ক্যালেইডোস্কোপ।

এবার খেলনাটিকে আলোর দিকে তাক করে ছিদ্রের ভেতর দিয়ে দেখো ও খেলনাটিকে ঘোরাতে থাকো আর রঙিন রঙিন নকশা দেখার মজা নাও।

আলোর প্রতিসরণের সূত্র

একটা সাদা কাগজে '**প্রতিসরণ**' কথাটি লিখে তার ওপর একটা স্বচ্ছ কাচের পেপারওয়েট বসাও। এবার পেপারওয়েটের ওপর থেকে দেখোতো পৃষ্ঠার তল থেকে লেখাটি কিছুটা ওপরে উঠে এসেছে বলে মনে হচ্ছে কিনা?

কেন এমন হলো?

কাচ ও বায়ু মাধ্যমে আলোকরশ্মিগুচ্ছের প্রতিসরণই এর কারণ।

তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে সে সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছ। এসো আমরা প্রতিসরণ সংক্রান্ত কিছু বিষয় মনে করার চেষ্টা করি।

পাশের ছবিটা লক্ষ করো ও নীচের শব্দগুলো দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

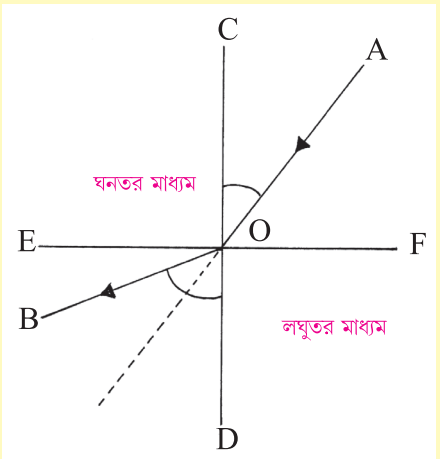

AO = ...

OB = ...

∠AOC = ...

∠BOD = ...

EOF = ...

COD = ...

[প্রতিসৃত রশ্মি, আপতন কোণ, অভিলম্ব, (মাধ্যমদ্বয়ের) বিভেদ তল, প্রতিসরণ কোণ, আপতিত রশ্মি।]

পাশের ছবিতে তুমি দেখতে পাচ্ছ, AO আপতিত রশ্মি লঘুতর মাধ্যম (a) পেরিয়ে, OB পথ ধরে ঘনতর মাধ্যমে (b) প্রবেশ করেছে। ফলে প্রতিসৃত রশ্মি OB অভিলম্ব EOF-এর দিকে সরে এসেছে।

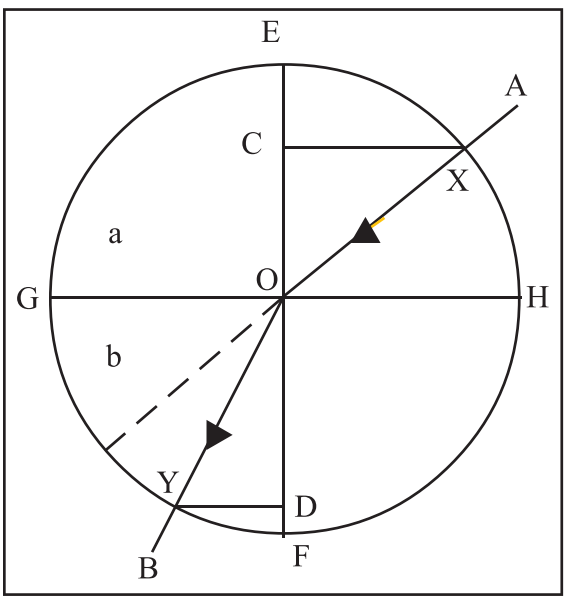

O বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে-কোনো ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকা হলো যা OA-কে X ও OB-কে Y বিন্দুতে ছেদ করে। X ও Y থেকে EOF-এর ওপর যথাক্রমে XC ও YD লম্ব টানা হলো।

AO আলোক রশ্মির আপতন কোণ বদলালে OB রশ্মির প্রতিসরণ কোণও বদলাবে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই XC ও YD-এর ভাগফল $\frac{XC}{YD}$-এর মান একই থাকবে।

প্রতিসরণের সময় যদি মাধ্যমদুটি একই থাকে ও একই রঙের আলো তির্যকভাবে একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায়, তাহলে আপতন কোণ বা প্রতিসরণ কোণ বদলালেও $\frac{XC}{YD}$ -এর মান বদলায় না। এই মানটিকে মাধ্যম a-এর সাপেক্ষে মাধ্যম b-এর প্রতিসরাঙ্ক বলে।

যখন, আলোকরশ্মি শূন্যস্থান থেকে অন্য মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় তখন ওই মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ককে মাধ্যমটির পরম **প্রতিসরাঙ্ক** বলে।

মনে রাখার বিষয় :

দুই মাধ্যমের আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক আলোর রঙের ও মাধ্যম দুটির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। লালরঙের আলোর ক্ষেত্রে লঘুতর আলোক মাধ্যম a -এর সাপেক্ষে ঘনতর আলোক মাধ্যম b -এর প্রতিসরাঙ্কের মান যত হবে,সবুজ বা নীল বা বেগুনি রঙের আলোর ক্ষেত্রে সেই প্রতিসরাঙ্কের মান বেশি হবে।

আলোর ক্ষেত্রে একটি মাধ্যমের চাইতে অন্য একটি মাধ্যম বেশি ঘন না লঘু তা ঠিক হয় ওই মাধ্যম দুটির পরম **প্রতিসরাঙ্কের** মান দিয়ে, মাধ্যম দুটির ঘনত্বের মান দিয়ে নয়।

আলোর প্রতিসরণ দুটি নিয়ম মেনে চলে :

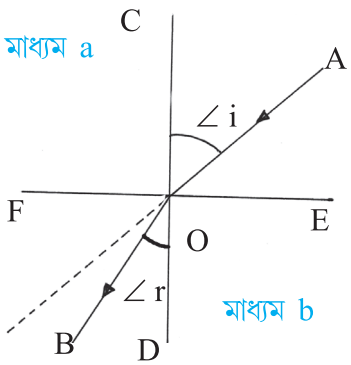

AO - আপতিত রশ্মি
OB - প্রতিসৃত রশ্মি
O - আপতন বিন্দু
FE - দুই মাধ্যমের বিভেদতল
CD - অভিলম্ব
$\angle AOC = \angle i$ = আপতন কোণ
$\angle BOD = \angle r$ = প্রতিসরণ কোণ

1. আপতিত রশ্মি ও দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে আপতন বিন্দুতে আঁকা অভিলম্ব যে সমতলের ওপর থাকে (যেমন তোমার খাতার পাতা, বা আমাদের এই বইয়ের পাতা), প্রতিসরণের পর প্রতিসৃত রশ্মিটিও ওই একই সমতলে থাকবে।

2. প্রতিসরণের সময়, যদি আলোর রং ও মাধ্যম দুটি একই থাকে, তাহলে প্রতিসরাঙ্কের মানও একই থাকবে অর্থাৎ আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের মান পরিবর্তিত হলেও প্রতিসরাঙ্কের মান পরিবর্তিত হবে না।

একটা কচুপাতা নাও। তার মধ্যে সামান্য একটু জল নাও। এবার দেখোতো জলের তলটা চকচক করছে কিনা? কাচের ফাটলে আলো পড়লেই বা সেই স্থান চকচক করে কেন?

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জানতে পেরেছ যে আলোকরশ্মি ঘনতর মাধ্যম পেরিয়ে, লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করলে, প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণের মান আপতন কোণ অপেক্ষা বড়ো হয়।

যদি আপতন কোণ $\angle i$ এর মান ক্রমশ বড়ো হতে থাকে, তাহলে ভেবে বলোতো প্রতিসরণ কোণের মানের কী পরিবর্তন হবে? ঠিক ধরেছ। প্রতিসরণ কোণ $\angle r$-এর মানও ক্রমশ বাড়তে থাকবে। এভাবে আপতন কোণের কোনো না কোনো মানের জন্য প্রতিসরণ কোণের মান 90^0 হবে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে প্রতিসৃত রশ্মিটি মাধ্যম দুটির বিভেদতল ঘেঁষে চলতে থাকবে। আপতন কোণের সেই মানকে ওই মাধ্যমদুটির সংকট কোণ বলা হয়। (চিত্র A)

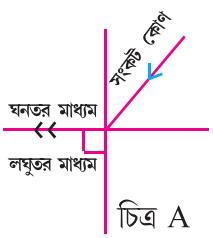

চিত্র A

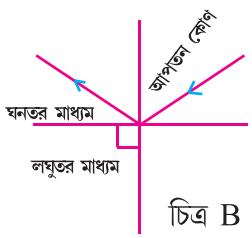

চিত্র B

আপতন কোণ > সংকট কোণ

এখন ভাবো, আপতন কোণের মান যদি মাধ্যম দুটির সংকট কোণের চেয়েও বড়ো হয়, তখন কী হবে?

সেক্ষেত্রে, আলোকরশ্মির কোনো অংশই দ্বিতীয় মাধ্যমে

প্রতিসৃত হবে না। আলোকরশ্মিটি মাধ্যমদুটির বিভেদতল থেকে প্রতিফলিত হয়ে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসবে। এই ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলে। (চিত্র B)

এবার ভেবে বলো দেখি, আলোকরশ্মি লঘুতর মাধ্যম থেকে ঘনতর মাধ্যমে যাত্রা করলে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন সম্ভব কি?

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা দেখেছ যে এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় দুই মাধ্যমের বিভেদতল থেকে আলোর একটি অংশ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে ও অন্য একটি অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়। কিন্তু যখন অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হয় তখন ওই প্রতিসৃত অংশটিও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। ফলে আপতিত আলোর পুরোটাই ফিরে পাওয়া যায়। ফলে সেক্ষেত্রে প্রতিফলিত আলোর তীব্রতাও সাধারণ প্রতিফলনের চাইতে বেশি হয়। অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের কারণে বস্তুকে তাই চকচকে দেখায়।

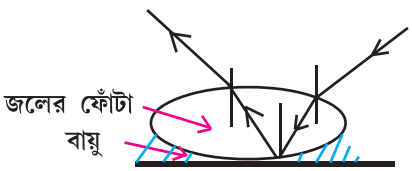

কচুপাতার ওপর জলের যে ফোঁটাটি নড়াচড়া করে বেড়ায় তার ওপর পড়া আলো বায়ু থেকে জলে প্রবেশ করে। আবার যখন জল থেকে বায়ুতে বেরিয়ে আসতে চায় তখন জল ও বায়ুর বিভেদতলে ওই মাধ্যমদুটির সংকট কোণের চেয়ে বেশি কোণে আপতিত হয়। ফলে ওই স্থানে আলোকরশ্মির অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। প্রতিফলিত রশ্মি দর্শকের চোখে এসে পৌঁছোলে দর্শক ওই স্থান চকচকে দেখে।

এবার নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো।

i) জলের ভেতর বুদবুদ চকচকে দেখায় কেন?

ii) হিরে চকচকে দেখায় কেন?

বায়ু সাপেক্ষে হিরের প্রতিসরাঙ্ক খুব বেশি। ফলে বায়ু সাপেক্ষে হিরের সংকট কোণ খুবই কম, মাত্র 24.5°। এমন কৌশলে হিরে কাটা হয় যাতে হিরে থেকে বায়ুমাধ্যমে যাত্রাকালে যে সমস্ত আলোকরশ্মির আপতন কোণের মান 24.5° অপেক্ষা বেশি হয় অর্থাৎ সংকট কোণকে ছাপিয়ে যায়, তাদের অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে।

অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের প্রাকৃতিক উদাহরণ :

মরুভূমিতে দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর তাপে বালি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে বালিসংলগ্ন বায়ুস্তরও উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে বাড়ে ও তার ঘনত্ব কমে হালকা হয়ে পড়ে। কিন্তু বায়ুর স্তরগুলির উষ্ণতা নীচ থেকে ওপর দিকে ক্রমশ কম হতে থাকে। ফলে নীচ থেকে ওপর দিকে বায়ুর স্তরগুলি ক্রমশ ঘন থেকে ঘনতর হতে থাকে।

ধরা যাক, দূরের কোনো এক গাছের S বিন্দু থেকে আলোকরশ্মিগুচ্ছ ক্রমশ নীচের দিকে নামতে থাকছে। ফলে ওই আলোকরশ্মিগুচ্ছ ক্রমান্বয়ে ঘনতর বায়ুস্তর থেকে লঘুতর বায়ুস্তরগুলি অতিক্রম করতে থাকে এবং ক্রমশই অভিলম্ব থেকে দূরে সরতে থাকে। এভাবে আপতন কোণের মান ক্রমশ বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে একসময়, পরপর অবস্থিত কোনো দুটি স্তরের সংকট কোণের মানকে ছাপিয়ে যায়। ফলে ওই স্তরদুটির বিভেদতলে আলোকরশ্মিগুচ্ছের অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে এবং প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ ওপর দিকে যাত্রা করে। এবার কিন্তু রশ্মিগুচ্ছ যথাক্রমে লঘুতর মাধ্যম থেকে ঘনতর মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে, ফলে তারা ক্রমশ অভিলম্বের

দিকে সরতে থাকে ও অবশেষে দর্শকের চোখে এসে পৌঁছোয়। চোখ এত আঁকাবাঁকা পথ অনুসরণ করতে পারে না ও S′ বিন্দুতে S বিন্দুর অসদ প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। এভাবে গোটা গাছটারই উলটানো অসদবিম্ব দর্শক দেখে।

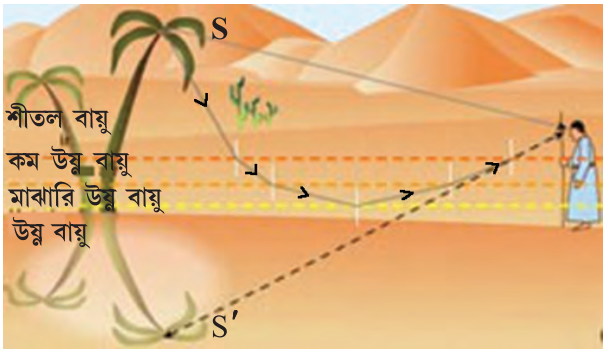

আবার, নীচের অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত স্তরের বায়ু হাল্কা হয়ে উপরে উঠে আসে ও উপরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্তরের বায়ু নীচে নেমে আসে। এর ফলে ঐ স্তরগুলোর মধ্যে একটি পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। প্রতি মুহূর্তে উষ্ণতার পরিবর্তনের ফলে বায়ুস্তরগুলোর ঘনত্ব ও প্রতিসরাঙ্ক অনবরত পরিবর্তিত হতে থাকে। ওই স্তরগুলোর মধ্য দিয়ে চলতে থাকা আলোকরশ্মিগুচ্ছের গতিপথ বারবার পরিবর্তন হয়। ফলে গঠিত প্রতিবিম্বের অবস্থানেরও প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটে। ফলে দর্শকের মনে হয় গাছের প্রতিবিম্ব কাঁপছে। দর্শক ভাবে, বুঝি গাছটি জলাশয়ের পাড়ে অবস্থিত যার প্রতিবিম্ব জলে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কাছে এসে দেখে কোথাও জল নেই। —মরুভূমির এই দেখার ভুলকেই **মরীচিকা** বলে।

1) গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত দুপুরবেলায় দূর থেকে পিচরাস্তার ওপর জল চকচক করছে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সামনে এসে দেখা যায় কোথাও কোনো জল নেই।

— ভেবে দেখোতো কেন এমন হয়।

2) ধরা যাক, শীতপ্রধান কোনো এক দেশে, জেটির ওপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। একটি নৌকা জেটি ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেছে। হঠাৎ ওই ব্যক্তি অবাক হয়ে দেখে আকাশের বুকে ওই নৌকাটা উলটোভাবে ভেসে যাচ্ছে! — এমন ঘটনা শীতপ্রধান দেশে দেখা যায়। কিন্তু কেন এমন হয়?

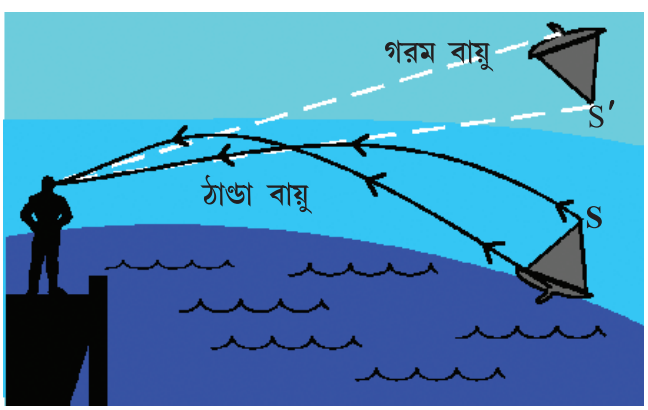

শীতপ্রধান দেশে নীচ থেকে ওপর দিকে বায়ুস্তরের ঘনত্ব ক্রমশ কমতে থাকে । বায়ুস্তরের ওপরের দিকের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাই দূরে অবস্থিত কোনো বস্তুর S বিন্দু থেকে আসা ঊর্ধ্বগামী আলোকরশ্মিগুচ্ছ ক্রমশ ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমের দিকে যাত্রা করে। ফলে তা ক্রমশ অভিলম্ব থেকে দূরে সরতে থাকে। ফলে আপতন কোণের মান বাড়তেই থাকে ও একসময় পরপর অবস্থিত কোনো দুটি স্তরের সংকট কোণের চেয়ে বেশি কোণে আপতিত হয়। ফলে সেই মাধ্যমদুটির বিভেদতলে আলোকরশ্মিগুচ্ছের অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে ও রশ্মিগুচ্ছ নীচের দিকে নামতে থাকে এবং ক্রমশ লঘুতর মাধ্যম থেকে ঘনতর মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। ফলে অভিলম্বের দিকে সরতে থাকে ও দর্শকের চোখে পড়ে। দর্শকের কাছে মনে হয় ওপরে অবস্থিত S বিন্দু থেকেই রশ্মিগুচ্ছ আসছে। ফলে দর্শক S′ বিন্দুতে S বিন্দুর অসদবিম্ব দেখে। এভাবে গোটা বস্তুটারই উলটানো প্রতিবিম্বকে আকাশে দেখতে পায়।

2.1 পদার্থের প্রকৃতি

পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম

আমাদের চারপাশে সমস্ত বস্তুই কোনো না কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি। পদার্থ বলতে তোমরা জেনেছ — পদার্থ মাত্রেরই ভর আছে, আয়তন আছে। এছাড়াও পদার্থের জাড্য ধর্ম (যে ধর্মের জন্য পদার্থ তার গতিশীল বা স্থিতিশীল অবস্থার পরিবর্তনে বাধা দেয়) বর্তমান।

এবার তোমরা নিম্নলিখিত পদার্থগুলো সাধারণ অবস্থায় কোনটা কঠিন কোনটা তরল আর কোনটা গ্যাসীয় তা নীচের প্রথম সারণিতে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও। এদের মধ্যে যেগুলোর বিশিষ্ট বর্ণ বা গন্ধ আছে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে সেগুলোর নাম, বর্ণ/গন্ধ দ্বিতীয় সারণিতে লেখো।

সাধারণ অবস্থায় থাকা পদার্থ — পারদ, সোনা, অক্সিজেন, বরফ, জল, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড; রুপো, কয়লা, তামা, গ্রানাইট, গ্লিসারিন, আলকাতরা, তুঁতে, সালফার(গন্ধক); ফসফিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, হাইড্রোজেন সালফাইড, আয়োডিন, মোম, নিকেল, কেরোসিন; বেঞ্জিন, স্পিরিট, অ্যামোনিয়া, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ; পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ; ন্যাপথালিন, কর্পূর, পেট্রোল, হাইড্রোজেন; পোড়া চুন, নিশাদল, সোডিয়াম, ক্লোরোফর্ম, চুনাপাথর।

পদার্থের নাম	সাধারণ অবস্থায়		
	কঠিন	তরল	গ্যাস

পদার্থের নাম	বর্ণ	গন্ধ

তাহলে তোমরা দেখলে ভৌত অবস্থা অনুযায়ী পদার্থকে তিনটে শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। মূলত পদার্থের অণুপরমাণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণের তারতম্যের কারণেই আমরা পদার্থের তিনরকম অবস্থা দেখতে পাই।

পদার্থ কি তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে?

আমরা প্রত্যেকেই আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি জল তিনটে অবস্থায় থাকতে পারে।

- কঠিন অবস্থায়..... তরল অবস্থায়..... গ্যাসীয় অবস্থায়.....

তাপের প্রভাবে কীভাবে জলের তিনটে অবস্থার পরিবর্তন হয় তা আমরা হাতেকলমে করে দেখতে পারি।

একটা বিকারে প্রায় 10 g বরফ নাও। পরের পৃষ্ঠার ছবির মতো করে একটা পরীক্ষাগারের জন্য ব্যবহৃত থার্মোমিটার বরফের মধ্যে ডোবাও। ভালো করে লক্ষ রেখো থার্মোমিটারের পারদ কুণ্ড যেন বরফের মধ্যে ডোবানো থাকে। এবার পরপর ধাপগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করো।

- বিকারটাকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করতে থাকো।
- যখন বরফ গলতে শুরু করল তখন তাপের উৎস সরিয়ে নাও এবং থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা লিখে রাখো।

- আরও কিছুটা তাপ দাও। সব বরফ যখন গলে জলে পরিণত হলো তখনকার তাপমাত্রা লিখে রাখো।
- কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় যেতে যা যা ঘটনা ঘটছে তা তুমি লক্ষ করো এবং লিখে রাখো।
- একটি কাচদণ্ড বিকারের মধ্যে রাখো। এবার বিকারের জলকে তাপ দাও ও কাচদণ্ড দিয়ে জলকে নাড়তে থাকো, যতক্ষণ না বিকারের জল ফুটতে শুরু করে। যখন সমস্ত জল ফুটতে শুরু করবে তখন থার্মোমিটারকে নীচের ছবির মতো করে ফুটন্ত জলের বাষ্পের সংস্পর্শে রাখতে হবে।

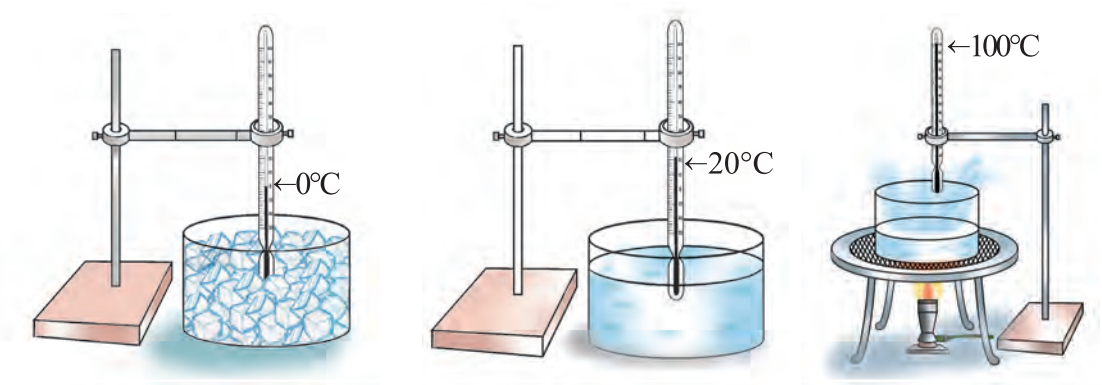

- তরল অবস্থা থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হবার সময় যা যা ঘটনা ঘটল তা তুমি লিখে রাখো।

পরীক্ষায় দেখা যাবে যে যতক্ষণ না সমস্ত বরফ (অর্থাৎ কঠিন) গলে জলে (অর্থাৎ তরলে) পরিণত হয়, ততক্ষণ তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না।

তোমরা নিশ্চয় এও লক্ষ করেছ সমস্ত কঠিন যখন গলে তরল হলো তারপর তাপ দিলে তরলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এক সময় তরলের সমস্ত অংশেই স্ফুটন শুরু হয়। যতক্ষণ না সমস্ত তরল ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়, ততক্ষণ ওই তরলের তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না।

- কোনো তরলের উপরিস্থিত চাপ পরিবর্তিত হলে তরলের স্ফুটনাঙ্ক পরিবর্তিত হয়।
- নির্দিষ্ট চাপে বিভিন্ন বিশুদ্ধ কঠিনের যেমন নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক থাকে, তেমনি বিভিন্ন বিশুদ্ধ তরলের নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক থাকে।

নীচের সারণিতে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কিছু বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক দেওয়া হলো।

বিশুদ্ধ কঠিনের নাম	গলনাঙ্ক (°C)	বিশুদ্ধ তরলের নাম	স্ফুটনাঙ্ক (°C)
জিঙ্ক	420	জল	100
সোনা	1063	ক্লোরোফর্ম	61
খাদ্যলবণ	801	বেঞ্জিন	80.1
লোহা	1530	ইথাইল অ্যালকোহল	78.3
রুপো	962	পারদ	357
অ্যালুমিনিয়াম	659	অ্যাসিটোন	56

নীচের ছবির ফাঁকা অংশ তোমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে পূরণ করো এবং এর থেকে বোঝার চেষ্টা করো, পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে হয়।

রেখাচিত্র 1

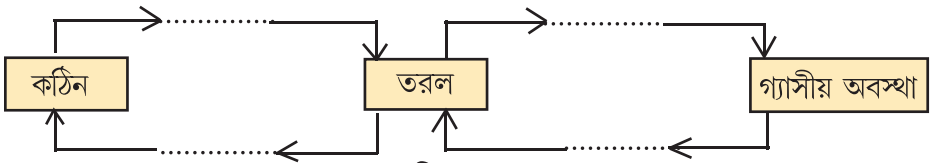

রেখাচিত্র 2

হাতে কলমে

সবসময়ে কঠিনকে তাপ দিলে তরল পাওয়া যায় কি? এসো একটা পরীক্ষা করে দেখি।

- পাশের ছবির মতো কিছুটা কর্পূরের গুঁড়ো চিনামাটির তৈরি প্লেটে নাও।
- প্লেটের উপর রাখা কর্পূরের গুঁড়োকে ছবির মতো করে একটা ফানেল দিয়ে ঢাকা দাও। ফানেলের মুখটা তুলো দিয়ে বন্ধ করো। তারপর ফানেলের গায়ে একটা জলে ভেজানো ফিল্টার কাগজ জড়িয়ে দাও।

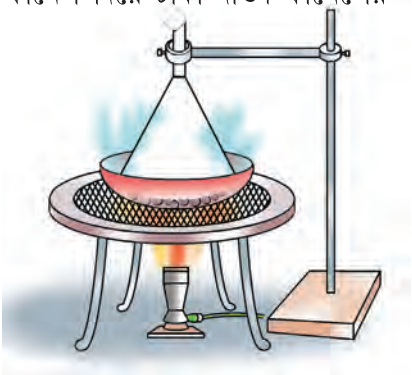

- এবার চিনামাটির তৈরি প্লেটকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করো।
- কী ঘটতে দেখছ তা খাতায় লিখে রাখো।
- ওই একই পরীক্ষা কর্পূরের বদলে ন্যাপথালিন, আয়োডিন, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (নিশাদল) নিয়ে পৃথকভাবে করলে দেখবে প্রতি ক্ষেত্রেই উপরে বর্ণিত রেখাচিত্র-2-এর মতো ঘটনা ঘটছে। কারণ এই পদার্থগুলোর সাধারণ উষ্ণতা ও চাপে কেবলমাত্র দুটো অবস্থা দেখা যায়, কঠিন অবস্থা ও গ্যাসীয় অবস্থা।

এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নীচের সারণিটি পূরণ করো :

পদার্থের ভৌত অবস্থা	নির্দিষ্ট আকার আছে/নেই	নির্দিষ্ট আয়তন আছে/নেই	প্রবাহী ধর্ম কেমন	স্থির উষ্ণতায় চাপ প্রয়োগ করলে আয়তনের পরিবর্তন হয় / কম হয়/প্রায় হয় না	স্থির চাপে তাপ প্রয়োগ করলে কী ঘটে	স্থির চাপে তাপ নিষ্কাশন করলে কী ঘটে
কঠিন						
তরল						
গ্যাসীয়						

আমাদের চারপাশে অসংখ্য কঠিন , তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে। সব কঠিন পদার্থের ধর্ম যেমন এক নয়, তেমনি সব তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের ধর্মও এক নয়। প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব কিছু কিছু বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে একটা পদার্থকে অন্য একটা পদার্থ থেকে আলাদা করে চেনা যায়। পদার্থের এইসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে **পদার্থের ধর্ম** বলে।

পদার্থের ধর্মগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (i) ভৌত ধর্ম (ii) রাসায়নিক ধর্ম

(i) ভৌত ধর্ম — পদার্থের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণ যেমন ভৌত অবস্থা, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, চৌম্বক ধর্ম, দ্রাব্যতা প্রভৃতি ধর্মগুলোর সাহায্যে শুধু পদার্থের বাহ্যিক অবস্থার ও প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু অভ্যন্তরীণ অণুর গঠনের পরিচয় পাওয়া যায় না। পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে কি করবে না তা এই ধর্ম দিয়ে বোঝা যায় না। এই ধর্মগুলোকে ভৌত ধর্ম বলে।

(ii) রাসায়নিক ধর্ম — যে ধর্ম থেকে কোনো পদার্থের অন্য পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার প্রবণতা ও ক্ষমতা লক্ষ করা যায় তাকেই ওই পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম বলে।

তড়িৎ প্রবাহের ফলে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়। এটা জলের রাসায়নিক ধর্ম। আবার সালফারকে বাতাসে পোড়ালে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটা সালফারের রাসায়নিক ধর্ম। লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে জিঙ্ক ধাতুর টুকরো যোগ করলে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটা জিঙ্কের একটা রাসায়নিক ধর্ম।

ভৌত ধর্মের সাহায্যে পদার্থের শনাক্তকরণ

- পাশের ছবির মতো তিনটে পাত্রে কিছুটা লোহার টুকরো, জল ও অক্সিজেন গ্যাস রাখা আছে। ছবি দেখে বলো কোন পাত্রে লোহার টুকরো, কোন পাত্রে জল এবং কোন পাত্রে অক্সিজেন আছে। কোন অনুভূতির দ্বারা ওই পদার্থগুলোকে তুমি শনাক্ত করলে তা যুক্তি দিয়ে লেখো।

A পাত্রে .....। B পাত্রে.....। C পাত্রে.....

তাহলে তোমরা দেখলে পদার্থের অবস্থা ভিন্ন হলে তাদের একটা থেকে অন্যটাকে দেখে সহজে চেনা যায়।

- তোমাকে চারটে পাত্রের একটাতে পেনসিলের শিস; একটাতে পেনসিলের শিসের মতো সরু লোহার তারের টুকরো, একটাতে গ্লিসারিন এবং অন্যটাতে জল দেওয়া হলো। তুমি চোখ বন্ধ করে হাতের দুটো আঙুলের মাঝে নিয়ে ঘষে দেখো। এইভাবে স্পর্শের সাহায্যে কোন পাত্রে কি পদার্থ আছে বলতে পারবে? পদার্থগুলো স্পর্শ করে তোমার কী অনুভূতি হলো তা পরের পৃষ্ঠার সারণিতে লিখে ফেলো।

পদার্থ	স্পর্শের অনুভূতি
লোহা	
পেনসিলের শিস	
গ্লিসারিন	
জল	

তাহলে তুমি দেখলে স্পর্শের দ্বারা অনেক পদার্থকে শনাক্ত করা যায়। এবার তুমি বিভিন্ন ধরনের পদার্থ সংগ্রহ করো এবং তাদের স্পর্শ করে ওইসব পদার্থের বিশেষ ভৌত ধর্ম চিনে রাখো।

- তোমাকে দুটো পাত্রের একটাতে ন্যাপথালিনের গুঁড়ো অন্যটায় কর্পূরের গুঁড়ো দেওয়া আছে। তুমি পদার্থের অন্য কোন ভৌতধর্মকে ব্যবহার করে পদার্থদুটোকে শনাক্ত করবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

.....

.....

আবার তোমাকে চারটে পাত্রে কেরোসিন, পেট্রোল, সরষের তেল ও নারকেল তেল দেওয়া হলো। তুমি কি ন্যাপথালিন ও কর্পূরকে যে ধর্মের সাহায্যে শনাক্ত করেছ সেই ধর্মের দ্বারাই এদের শনাক্ত করতে পারবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

.....

অ্যামোনিয়া (NH_3) ও হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) প্রত্যেকেই গ্যাসীয় পদার্থ কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বিশিষ্ট গন্ধ আছে। অ্যামোনিয়া গ্যাসের গন্ধ ঝাঁঝালো, অনেক সময় প্রস্রাবাগারে এই গন্ধ পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ পচা ডিমের মতো। তাহলে তুমি পদার্থগুলোর এই বিশেষ ভৌত ধর্ম গন্ধকে ব্যবহার করে সহজেই পদার্থগুলোকে শনাক্ত করতে পারবে।

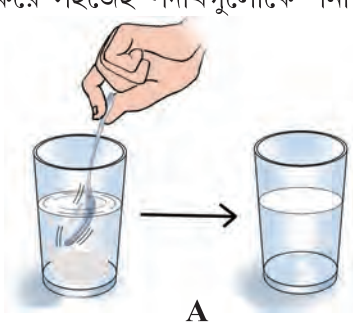

A

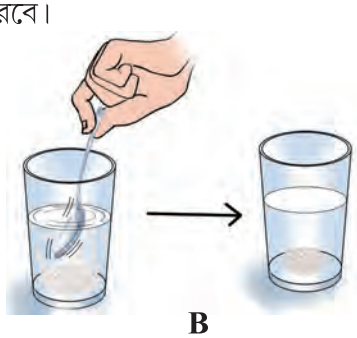

B

হাতেকলমে

ওপরের ছবির মতো করে দুটো কাচের গ্লাসে (A ও B) সমপরিমাণ জল নাও। এবার A গ্লাসের জলে এক চামচ চিনির গুঁড়ো এবং B গ্লাসের জলে এক চামচ চকের গুঁড়ো যোগ করো, এবার চামচ দিয়ে ভালো করে দুটো গ্লাসের জলই নাড়তে থাকো। কিছুক্ষণ পর তোমার পর্যবেক্ষণ পরের পৃষ্ঠার সারণিতে লেখো।

কোন গ্লাসে	জলে পদার্থ যোগ করার পর কী দেখলে?	জলে পদার্থ যোগ করে চামচ দিয়ে নাড়ার পর কী দেখলে?	এর থেকে তুমি পদার্থগুলোর দ্রাব্যতার সম্বন্ধে কী ধারণা করতে পারো?
A			
B			

ওই একই রকম পরীক্ষা চিনি ও ন্যাপথালিনের গুঁড়ো, নুন ও কর্পূরের গুঁড়ো, তুঁতের গুঁড়ো ও সালফারের গুঁড়ো নিয়ে করে দেখো। এবার তুমি ওপরের পরীক্ষাগুলো জলের বদলে কেরোসিন বা পেট্রোল নিয়ে করে দেখো। তোমাদের পর্যবেক্ষণ নীচের সারণিতে দেওয়া পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মেলে কিনা দেখো। (যদিও পরের সারণিতে কার্বন ডাইসালফাইডে দ্রাব্য/অদ্রাব্য পদার্থের তালিকা দেওয়া আছে তবুও তোমরা কখনওই কার্বন ডাইসালফাইড নিয়ে এই পরীক্ষা করতে যাবে না।)

পদার্থ	জলে দ্রাব্য/ অদ্রাব্য	কেরোসিনে দ্রাব্য/ অদ্রাব্য	পেট্রোলে দ্রাব্য/ অদ্রাব্য	কার্বন ডাইসালফাইডে দ্রাব্য/অদ্রাব্য
চিনি	দ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য
নুন	দ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য
কর্পূর	সামান্য দ্রাব্য	দ্রাব্য	দ্রাব্য	দ্রাব্য
তুঁতের গুঁড়ো	দ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য
সালফার	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য	দ্রাব্য

তাহলে আমরা দেখলাম বিভিন্ন দ্রাবকে দ্রবীভূত হবার ক্ষমতা বা দ্রাব্যতা দিয়েও বেশ কিছু পদার্থকে শনাক্ত করা যায়।

- তোমাকে A ও B একই রকম রং করা একটা তামার টুকরো এবং একটা লোহার টুকরো দেওয়া হলো। তুমি চৌম্বক ধর্মের সাহায্যে দুটো পদার্থকে শনাক্ত করো। তোমার পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত নীচের সারণিতে লিপিবদ্ধ করো।

পদার্থ	চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়/হয় না	পদার্থটা কী
A	হয় না	
B	হয়	

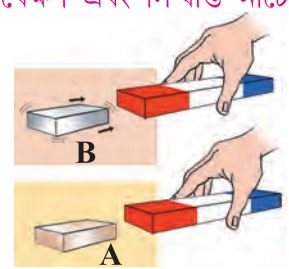

চুম্বকের সাহায্যে ওই একই রকম পরীক্ষা তুমি নিকেল, রুপা, সোনা, দস্তা, সিসা ও অ্যালুমিনিয়ামের টুকরো নিয়ে করে দেখো এবং নীচের মতো সারণিতে তোমার পর্যবেক্ষণ লেখো।

পদার্থ	চৌম্বক ধর্ম আছে/নেই	পদার্থ	চৌম্বক ধর্ম আছে/নেই
নিকেল	আছে	কোবাল্ট	আছে
রুপো		অ্যালুমিনিয়াম	

● তোমরা আগেই জেনেছ প্রত্যেক বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক আছে। আবার এও জেনেছ প্রত্যেক বিশুদ্ধ তরল পদার্থের নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক আছে।

A, B, C, D চারটে পাত্রের মধ্যে A ও B পাত্রে দুটো কঠিন পদার্থ আছে এবং C ও D পাত্রে দুটো বিশুদ্ধ তরল পদার্থ আছে। A ও B পাত্রের পদার্থের গলনাঙ্ক যথাক্রমে 659°C এবং 1063°C। তাহলে A ও B পাত্রের পদার্থ দুটো কী কী? (আগে দেওয়া গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক সারণির সাহায্য নাও)

A পাত্রের কঠিন পদার্থের নাম .....

B পাত্রের কঠিন পদার্থের নাম .....

অনুরূপভাবে C ও D পাত্রের তরল দুটোর স্ফুটনাঙ্ক দেওয়া আছে। স্ফুটনাঙ্ক দুটো ব্যবহার করে পদার্থ দুটোকে শনাক্ত করো।

C ও D পাত্রের তরলের স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে 78.3°C এবং 56°C।

C পাত্রের তরলের নাম ..... এবং D পাত্রের তরলের নাম.....।

সুতরাং বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক এবং বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটনাঙ্ক জানা থাকলে সহজেই বিভিন্ন বিশুদ্ধ কঠিন ও তরলকে শনাক্ত করতে পারি।

রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে পদার্থের শনাক্তকরণ

নির্দিষ্টভাবে কোনো পদার্থকে শনাক্ত করতে হলে অনেক সময়েই সেই পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের পরীক্ষা করা দরকার। কোনো পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ণয় করার জন্য তাকে খোলা হাওয়ায় উত্তপ্ত করলে কী হয় তা দেখা হয়। আবার জল, অ্যাসিড, ক্ষার ও অন্যান্য নানান পদার্থের সংযোগে পরীক্ষণীয় পদার্থের কী পরিবর্তন হয় এবং কী কী নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় তা পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

● নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস বর্ণহীন কিন্তু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) বাদামি বর্ণের।

একটি গ্যাসজারে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস আছে। গ্যাসজারের মুখ খুললে দেখা যায় বাদামি বর্ণের গ্যাস নির্গত হচ্ছে। তুমি তোমার শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সমীকরণের শূন্যস্থান পূরণ করো। তার থেকে তুমি বলো এই ঘটনার জন্য দায়ী কে?

$2NO + ... = 2NO_2$

তাহলে তোমরা দেখলে বাতাসের সংস্পর্শে এসে কোনো কোনো পদার্থের নানা ধরনের পরিবর্তন হয়। এর সাহায্যে একটা পদার্থকে অন্য পদার্থ থেকে আলাদা করে শনাক্ত করা যেতে পারে।

তোমাকে কিছুটা চিনির গুঁড়ো ও কিছুটা পোড়াচুনের গুঁড়ো দেওয়া হলো। জলের সঙ্গে মিশিয়ে কীভাবে তাদের মধ্যে পার্থক্য করবে?

দুটো গ্লাসে জল নিয়ে একটার মধ্যে খানিকটা চিনির গুঁড়ো আর অন্যটার মধ্যে কিছুটা পোড়াচুনের গুঁড়ো মেশাও। গ্লাস দুটোকে হাত দিয়ে চেপে ধরো ও তোমার পর্যবেক্ষণ লেখো।

জলের মধ্যে কী মেশালে	কী দেখলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়
চিনির গুঁড়ো		
পোড়াচুনের গুঁড়ো		

জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যদি কোনো পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন আনে তবে সেই পদার্থকে অন্য পদার্থ থেকে সহজে চেনা যায়। তোমাদের জেনে রাখা দরকার সোডিয়াম বা পটাশিয়াম-এর মতো ধাতু জলের সংস্পর্শে এলেই তীব্র বিক্রিয়া ঘটে এবং প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়ে আগুন জ্বলে ওঠে।

- তোমাকে দুটো পাত্রে (A ও B) একটাতে নুনের গুঁড়ো অন্যটাতে চিনির গুঁড়ো দেওয়া হলো। তুমি স্বাদ না নিয়ে কোনটা নুন এবং কোনটা চিনি কীভাবে চিনবে? এসো একটা পরীক্ষা করা যাক।

হাতেকলমে

প্লাস্টিকের বা কাঠের হাতল লাগানো দুটো স্টিলের চামচের একটায় কিছুটা চিনির গুঁড়ো, আর অন্যটায় কিছুটা নুন নিয়ে বড়ো মোমবাতির সাহায্যে ভালো করে গরম করো। তুমি যা দেখতে পাবে তা থেকে কীভাবে পদার্থ দুটোকে চেনা যাবে তা দেখো।

কোনো পদার্থকে তীব্রভাবে গরম করলে	কী ঘটতে দেখবে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়
চিনির গুঁড়ো	প্রথমে বাদামি রং নেবে তারপর আরো গরম করলে কালো হয়ে যাবে	
নুন	চোখে দেখা যাবে এমন কোনো পরিবর্তন হবে না।	শুধু গরম হবে, সামান্য জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু অন্য কোনো পরিবর্তন হবে না।

এবার তোমরা তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্য নিয়ে নীচের পদার্থগুলোকে সাবধানে টেস্টটিউবে গরম করে দেখো। তোমাদের পর্যবেক্ষণ নীচের সারণিতে লেখো।

যে পদার্থকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করা হলো	কী পরিবর্তন হলো
1) জলযুক্ত কিউপ্রিক নাইট্রেট	
2) কঠিন আয়োডিন	
3) ম্যাগনেশিয়াম তার	তীব্র আলোর সৃষ্টি করে। প্রধানত সাদা রঙের ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড (MgO) উৎপন্ন হয়।

ওপরের ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন পদার্থের উপর তাপের প্রভাব আছে। অনেক পদার্থ আছে

যাদের ওপর তাপ প্রয়োগ করলে বিক্রিয়া ঘটে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাপ প্রয়োগ দ্বারা আমরা বেশ কিছু পদার্থকে শনাক্ত করতে পারি।

- আলাদা আলাদা পদার্থসহ তিনটে টেস্টটিউব A, B, ও C তোমাকে দেওয়া হলো। টেস্টটিউবগুলোয় জিঙ্কের গুঁড়ো, লোহার গুঁড়ো এবং ফেরাস সালফাইডের টুকরো আছে। তুমি কীভাবে কোন টেস্টটিউবে কী আছে তা শনাক্ত করবে?

হাতেকলমে

তিনটে টেস্টটিউবের মধ্যেই তুমি লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করো। তোমার পর্যবেক্ষণ নীচের সারণিতে দেওয়া পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলছে কিনা দেখো এবং সেখান থেকে পদার্থগুলোকে শনাক্ত করো।

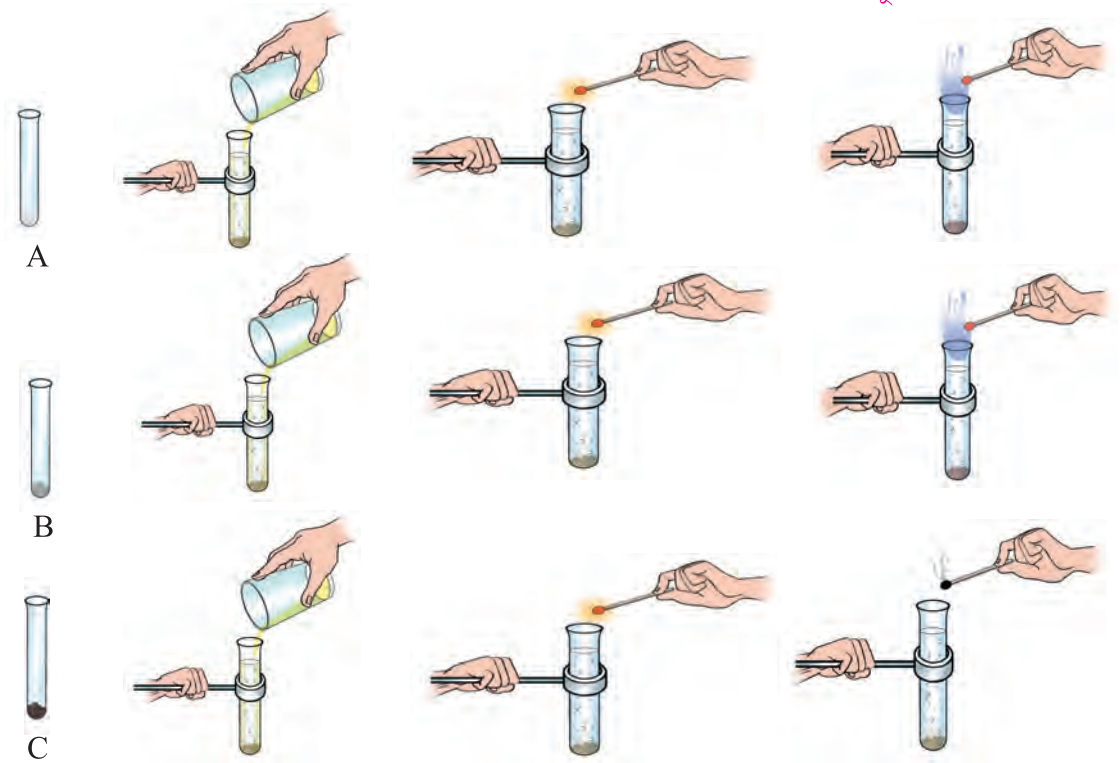

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ ও সমীকরণ
টেস্টটিউবে জিঙ্কের (Zn) গুঁড়োর সঙ্গে লঘু H_2SO_4 যোগ করা হলো।	বুদবুদ আকারে বর্ণহীন, গন্ধহীন হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। নির্গত গ্যাসে জ্বলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করালে গ্যাস শব্দসহ নীল শিখায় জ্বলে উঠেই নিভে যায়। $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$
টেস্টটিউবে লোহার (Fe) গুঁড়োর সঙ্গে লঘু H_2SO_4 যোগ করা হলো।	বুদবুদ আকারে যে বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস নির্গত হয় তা আগুনের স্পর্শে শব্দসহ নীলাভ শিখায় জ্বলে উঠেই নিভে যায়। উৎপন্ন দ্রবণের বর্ণ খুব ফিকে সবুজ হয়। $Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2$
টেস্টটিউবে ফেরাস সালফাইডের (FeS) সঙ্গে লঘু H_2SO_4 যোগ করা হলো।	বুদবুদ সৃষ্টি করে পচা ডিমের মতো গন্ধযুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাস বের হয়। $FeS + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2S$

তাহলে তোমরা দেখলে বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া ভিন্ন হয়। সুতরাং অ্যাসিড যোগ করে বিভিন্ন পদার্থকে শনাক্ত করা যায়। অ্যাসিড যোগ করে আর কোন কোন পদার্থকে শনাক্ত করা যায় তা জানার চেষ্টা করো।

অ্যাসিড দিয়ে যেমন কোনো পদার্থকে চেনা যায়, ক্ষারকীয় পদার্থ দিয়ে কোনো জিনিসকে কীভাবে শনাক্ত করা যায়?

হাতেকলমে

একটা খলের (Mortar) মধ্যে কিছুটা নুন নাও। তার সঙ্গে কিছুটা খাবার সোডা মেশাও। এবার নুড়ির (Pestle) সাহায্যে ভালো করে মিশ্রণটাকে ঘষে গন্ধ নাও। একইভাবে কিছুটা নিশাদল বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে তার মধ্যে খাবার সোডা মিশিয়ে ঘষে সাবধানে তার গন্ধ নাও। তোমার অনুভূতি নীচে লেখো। পরীক্ষা শেষে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

খাবার সোডার সঙ্গে কোন পদার্থের বিক্রিয়া করানো হলো	কীরকম গন্ধ পেলে
নুন	
নিশাদল	

টেস্টটিউবে নমুনা নিয়ে তার মধ্যে কলিচুন বা কস্টিক সোডা মিশিয়ে সাবধানে গরম করলে এই পরীক্ষায় আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে।

● এবার তোমরা বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে যা জানলে তা থেকে নীচের সারণির বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিককে মেলাও।

বাঁদিক		ডানদিক	
(i)	সাধারণ অবস্থায় ব্রোমিন	(a)	বাদামি বর্ণের গ্যাস
(ii)	পারদ	(b)	গাঢ় লাল রঙের তরল পদার্থ
(iii)	নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড	(c)	গরম করলে কালো হয়ে যায়
(iv)	ক্লোরিন	(d)	জলে মেশালে ঠান্ডা হয়ে যায়
(v)	অ্যামোনিয়া	(e)	সবুজাভ হলুদ বর্ণের ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস
(vi)	গন্ধক /সালফার	(f)	তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস
(vii)	নিশাদল	(g)	চকচকে রুপোলি ভারী তরল পদার্থ
(viii)	চিনি	(h)	ফিকে হলুদ রঙের কঠিন পদার্থ

ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

তোমরা আগেই জেনেছ প্রায় 92 টি প্রকৃতিজাত মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে। ওই প্রকৃতিজাত মৌলগুলোর প্রায় 70টিই ধাতু, কিছু অধাতু এবং নিষ্ক্রিয় মৌল আছে। আবার কিছু মৌল আছে যাদের মধ্যে ধাতু এবং অধাতু উভয়ের ধর্মই বর্তমান; তাদের ধাতুকল্প বলা হয়। তোমাদের চেনা কতকগুলো পদার্থের নাম ও চেনা জিনিসের নাম নীচের সারণিতে দেওয়া হলো। তার মধ্যে কী কী মৌল থাকতে পারে তা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে লেখো।

জিনিস/পদার্থের নাম	কী কী মৌল দিয়ে তৈরি
1. ইলেকট্রিকের তার	
2. দা, কুড়ুল, শাবল	
3. গহনা	
4. কেটলি, ডেকচি, বাসনপত্র	
5. গাড়ির ব্যাটারির ভেতরের পাত	

তাহলে তোমরা দেখলে সব মৌল দিয়ে একইরকম জিনিস তৈরি করা যায় না। আমাদের দৈনন্দিন কাজে শক্ত জিনিস কাটতে হলে দা বা কুড়ুল ব্যবহার করা হয়। দা বা কুড়ুল লোহা দিয়ে তৈরি, অ্যালুমিনিয়ামের নয়। আবার চায়ের কেটলি তৈরি করা হয় অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে, কার্বন দিয়ে নয়। এসো আমরা বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে ধাতু আর অধাতুর বৈশিষ্ট্য জানার চেষ্টা করি। আমরা আগেই জেনেছি মৌলগুলোর ধর্ম জানতে হলে তাদের বাহ্যিক কিছু ধর্ম জানা দরকার, যাকে আমরা ভৌত ধর্ম বলে থাকি। আবার সেইসমস্ত পদার্থের অন্য পদার্থের সঙ্গেও বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার প্রবণতা ও ক্ষমতা লক্ষ করা যায়। এই ধর্মগুলোকে তাদের রাসায়নিক ধর্ম বলে।

মৌলগুলির ভৌতধর্ম জানার জন্য তোমরা কিছু পরীক্ষা করতে পারো। এই পরীক্ষাগুলো করার জন্য যেগুলি সহজেই পাওয়া যায় যেমন লোহা, কপার (তামা), অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লেড (সিসা), জিঙ্ক (দস্তা), সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতু এবং কার্বন, সালফার, আয়োডিন প্রভৃতি অধাতু নমুনা হিসাবে ব্যবহার করতে পারো।

ধাতু ও অধাতুদের উজ্জ্বলতা (Lustre) ধর্মের পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : পুরোনো লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন, গ্রাফাইট, সালফারের টুকরো, শিরীষ কাগজ।

কি করলে	মৌলের ক্ষেত্রে	শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষার আগে দেখতে কেমন ছিল	শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষার পর দেখতে কেমন হলো
প্রথম অবস্থায় আনা মৌলগুলিকে নিয়ে শিরীষ কাগজ দিয়ে ভালো করে ওদের বাইরের তল পরিষ্কার করা হলো। পরিষ্কার করার পর পদার্থগুলোকে রোদে ধরা হলো।	লোহা	অনুজ্জ্বল	চকচকে
	অ্যালুমিনিয়াম		
	তামা		
	সিসা		
	কার্বন		
	সালফার	অনুজ্জ্বল	অনুজ্জ্বল

আগের পরীক্ষা থেকে নিশ্চয় তোমাদের এই ধারণা হয়েছে যে ধাতুগুলি উজ্জ্বল ও চকচকে। আয়োডিন অধাতু হলেও তা উজ্জ্বল। অন্যান্য অধাতুগুলো অনুজ্জ্বল।

ধাতু ও অধাতুদের কাঠিন্যের (Hardness) পরীক্ষা :

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

- লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, জিঙ্ক, সিসা, কাঠকয়লা, সালফার প্রভৃতির টুকরো
- একটা ছুরি

এই পরীক্ষাটি শিক্ষক/শিক্ষিকা করে দেখাবেন।

কী করা হলো	মৌল	কী দেখলে
একটি ছুরি দিয়ে উপরে দেওয়া নমুনাগুলোর টুকরো কাটার চেষ্টা করা হলো।	লোহা	
	অ্যালুমিনিয়াম	
	তামা	
	জিঙ্ক	
	সিসা	
	কাঠকয়লা (কার্বন)	

ওপরের পরীক্ষা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে সাধারণত ধাতুগুলো কঠিন। সব ধাতুদের কাঠিন্য এক নয়। তবে মনে রাখা দরকার পারদ ধাতু হলেও তরল এবং ব্রোমিন অধাতু হলেও তরল। তবে সাধারণ উষ্ণতা ও চাপে বেশিরভাগ অধাতু গ্যাসীয় যেমন — অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

নমনীয়তা (Malleability) ধর্মের পরীক্ষা:

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

- লোহা, তামা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, সিসা, কার্বন, সালফার প্রভৃতি ধাতু ও অধাতুর টুকরো
- একটা নিরেট লোহার ব্লক
- একটা লোহার তৈরি ভারী হাতুড়ি

কী করলে	মৌল	কী দেখলে
লোহার ব্লকের উপর একে একে লোহা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম ..... প্রভৃতির টুকরো রাখো এবং হাতুড়ি দিয়ে জোরে জোরে কয়েকবার আঘাত করো।	লোহা	
	তামা	
	জিঙ্ক	
	অ্যালুমিনিয়াম	
	সিসা	
	কার্বন	
	সালফার	

তাহলে দেখলে ধাতুগুলোকে পিটিয়ে পাতে পরিণত করা যায়। সোনা ও রুপার এই ধর্ম সব থেকে বেশি। অধাতুগুলোর এই রকম ধর্ম নেই। তারা গুঁড়ো হয়ে যায়।

ধাতু ও অধাতুদের প্রসারণশীলতা (Ductility) ধর্মের পরীক্ষা:

প্রত্যেক ধাতুর প্রসারণশীলতা (ductility) এক নয়। সব ধাতু থেকে যেমন তার তৈরি করা যায় না, তেমনি শুধু একটা অধাতুকে ব্যবহার করেও তার তৈরি করা যায় না। সামান্য এক গ্রাম সোনা থেকেখুব সরু লম্বা তার তৈরি করা যায়, এক গ্রাম লোহা থেকে কিন্তু তা করা যায় না। এর থেকে সোনার প্রসারণশীলতা (ductility) লোহার চেয়ে কম না বেশি বলে তোমার মনে হয়?

.....।

পদার্থের তাপ পরিবাহিতার (Conduction of Heat) পরীক্ষা :

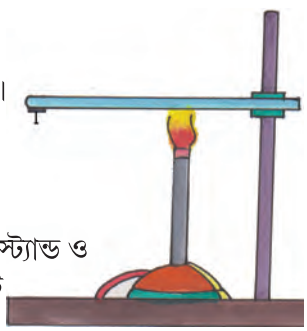

প্রয়োজনীয় দ্রব্য :

(i) একটু মোটা ধরনের অ্যালুমিনিয়াম বা তামার তার (অথবা দণ্ড), (ii) একটা স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প যা দিয়ে ছবির মতো করে তারকে আটকানো যায়, (iii) একটা স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বাতি, (iv) একটা ধাতব পিন।

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়
অ্যালুমিনিয়াম দণ্ডের একদিকের মাথায় মোম দিয়ে ছবির মতো করে পিনটা আটকাও এবং দণ্ডের অন্য দিকটা ক্ল্যাম্প দিয়ে স্ট্যান্ডের সঙ্গে আটকে দাও। এবার ছবির মতো করে একটা বার্নার জ্বালিয়ে ক্ল্যাম্পের কাছে অ্যালুমিনিয়াম দণ্ডের নীচে বেশ কিছুক্ষণ ধরো। লক্ষ করো কতক্ষণ পর মোম গলে পিনটা খসে পড়ল।		

আগের পরীক্ষার মতো একই মাপের লোহা, তামা, সিসা, জিঙ্ক, কার্বন দণ্ড (টর্চের ব্যাটারি থেকে নাও) নিয়ে পরীক্ষা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পিন খসে পড়তে কত সময় লাগল তা লিপিবদ্ধ করো।

মৌল	প্রত্যেক ক্ষেত্রে পিনের খসে পড়তে কত সময় লাগল	এর থেকে তুমি কী কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারো
লোহা		
তামা		
সিসা		
জিঙ্ক		
কার্বন দণ্ড		

তাহলে তোমরা দেখলে ধাতুগুলোর সবক্ষেত্রে প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটছে। গ্রাফাইট অধাতু হলেও ধাতুদের মতো তাপের সুপরিবাহী। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে পদার্থগুলোকে তাপ পরিবহন করার ক্ষমতা অনুসারে সাজাও।
.....।

অধাতুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা করতে গেলে কার্বন, সালফার পুড়ে যাবে এবং কার্বনের ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফারের ক্ষেত্রে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে। তাই ধাতু ও অধাতুর তাপ পরিবাহিতার তুলনা করতে নিম্নলিখিতভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য :

- ছবির মতো দুটো ধাতুর তৈরি পাত্র
- লোহার গুঁড়ো, কার্বন গুঁড়ো
- কয়েক টুকরো মোম
- বুনসেন বার্নার
- তারজালি

কী করলে	কী দেখলে	এর থেকে ধাতু ও অধাতুদের তাপ পরিবাহিতার সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হলো
ছবির মতো দুটো পাত্রের একটার মধ্যে লোহার গুঁড়ো ও অন্যটার মধ্যে কার্বন গুঁড়ো রাখো। এবার কার্বন গুঁড়ো ও লোহার গুঁড়োর মাঝে ছবির মতো করে এক টুকরো করে মোম রাখ। বার্নার দিয়ে পাত্রদুটো গরম করো। বেশ কিছুক্ষণ গরম করার পর পাত্রে রাখা মোমের অবস্থা লক্ষ করো।	• লোহার গুঁড়োর উপর রাখা মোমের অবস্থা কী হলো? • কার্বন গুঁড়োর উপর রাখা মোমের অবস্থা কী হলো?	

সাধারণভাবে ধাতুগুলো তাপের সুপরিবাহী ও অধাতুগুলো তাপের কুপরিবাহী। তবে মনে রাখতে হবে হিরে কিংবা গ্রাফাইট অধাতু হলেও তাপের সুপরিবাহী।

ধাতু ও অধাতুর তড়িৎ পরিবাহিতার (Conduction of Electricity) পরীক্ষা:

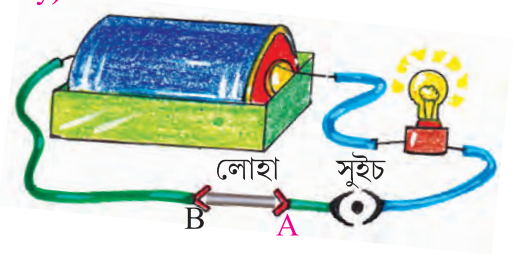

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

- একটা ব্যাটারি
- হোল্ডার সমেত একটা বালব
- তিন টুকরো তামার তার
- দুটো ধাতুর তৈরি ক্লিপ
- লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক, কাঠকয়লা, গ্রাফাইট, সালফার (গন্ধক) প্রভৃতির টুকরো

কী করলে	কী দেখলে	এর থেকে কারা বিদ্যুতের সুপরিবাহী ও কারা বিদ্যুতের কুপরিবাহী বলে তোমার মনে হয়
ছবির মতো করে ব্যাটারি, বালব ও তার আটকাও। তারের দুই প্রান্তে A ও B দুটি ধাতুর তৈরি ক্লিপ যোগ করো। এবার বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুর টুকরোগুলোর একটি প্রান্তে A ও অন্য প্রান্তে B দিয়ে সংযোগ করো। প্রতিক্ষেত্রে বালব জ্বলল কি জ্বলল না তা লক্ষ করো।	লোহার ক্ষেত্রে:	
	তামার ক্ষেত্রে:	
	অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে:	
	জিঙ্কের ক্ষেত্রে:	
	কাঠকয়লার ক্ষেত্রে:	
	গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে:	
	সালফারের ক্ষেত্রে:	

তুমি নিশ্চয়ই ইলেকট্রিক তার দিয়ে লাইট জ্বালাতে দেখেছ। ঐ তারগুলোর ওপর একটা PVC (পলিভিনাইল ক্লোরাইড) কিংবা রাবারের আস্তরণ দেওয়া থাকে। কেন ধাতব তারের ওপর এই ধরনের আস্তরণ দেওয়া থাকে বলোতো? .....।

ধাতব শব্দ ও অধাতব পদার্থের শব্দের (Sonority) তুলনা :

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

- লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি একটা করে প্লেট
- কাঠের বারকোশ
- একটা ছোটো কাঠের হাতুড়ি
- একটা ক্লিপ
- কিছুটা দড়ি

কী করলে	কী শুনলে	এর থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পারো
ছবির মতো করে এক একটা প্লেটকে ঝোলাও এবং হাতুড়ি দিয়ে কয়েকবার আঘাত করো। ধাতুগুলোর তৈরি পাত্রের ও কাঠের তৈরি পাত্রের শব্দ কেমন।		

এবার তুমি ওপরের ঘটনা থেকে বলোতো স্কুলের ঘন্টা কী দিয়ে তৈরি (ধাতু/অধাতু) এবং কেন এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি? .....।

ওপরের পরীক্ষাগুলো থেকে তুমি দেখলে শুধুমাত্র পদার্থের ভৌত ধর্ম দিয়ে ধাতু ও অধাতুকে শনাক্ত করা যায় না। কেন-না ধাতু ও অধাতুদের ভৌত ধর্মের নানা ধরনের মিলও যেমন আছে আবার কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন —

সাধারণ তাপমাত্রায় বেশিরভাগ ধাতু উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কঠিন পদার্থ হলেও পারদ সাধারণ তাপমাত্রায় তরল ধাতু। গ্যালিয়াম (Ga) ও সিজিয়াম (Cs) ধাতু হলেও এদের গলনাঙ্ক যথাক্রমে 29.78°C এবং 28.4°C।

- লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ধাতু হলেও অন্য ধাতুদের মতো কঠিন নয় অপেক্ষাকৃত নরম। এদের সামান্য ধারালো ছুরি দিয়ে কাটা যায়।
- অধাতুরা সাধারণত অনুজ্জ্বল হয়, কিন্তু কেলাসিত আয়োডিনের উজ্জ্বলতা আছে।
- কার্বন অধাতু। কার্বন বিভিন্ন রূপে থাকতে পারে। এদের কার্বনের রূপভেদ বলে। কার্বনের দুটি রূপভেদ হলো হিরে ও গ্রাফাইট। হিরে উজ্জ্বল এবং প্রকৃতিজাত পদার্থের মধ্যে সবথেকে কঠিন। হিরে তাপের সুপরিবাহী কিন্তু তড়িতের কুপরিবাহী। গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল অধাতু হলেও তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী।

ভেবে দেখো

- এমন কোনো ধাতুর কথা বলতে পারো কী যাকে বোতল, কাপ আর প্লেটে রাখলে এক একবার এক একরকম আকৃতির দেখাবে?
- ওপরে তোমরা যেসব ধাতুর কথা জানলে তার মধ্যে এমন কোন ধাতু আছে যা মে এবং ডিসেম্বর মাসে একই ভৌত অবস্থায় নাও থাকতে পারে?
- পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণায় বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের খুব পাতলা ধাতব পাতের প্রয়োজন হয়েছিল। তোমার কী মনে হয় নিচের কোন ধাতু তিনি সেই উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছিলেন— দস্তা / তামা / লোহা / সোনা?
- ধরো হিরে গ্রাফাইটের চেয়েও সস্তা হয়ে গেছে। তাহলে কি তুমি ব্যাটারির তড়িৎ দ্বার তৈরি করতে গ্রাফাইটের বদলে হিরে ব্যবহার করবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
- ইলেকট্রিকের বাল্ব জ্বললে খুব গরম হয়ে যায়। বাল্বের মধ্যের সরু তার (ফিলামেন্ট) তৈরি হয় টাংস্টেন ধাতু দিয়ে। এই কাজে টাংস্টেনের কোন কোন ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ বলে তোমার মনে হয়?

ব্যতিক্রম নিয়ে আলোচনা থেকে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ধাতু ও অধাতুদের সঠিকভাবে শনাক্ত করতে হলে তাদের ভৌত ধর্মই যথেষ্ট নয়। রাসায়নিক ধর্মও জানা প্রয়োজন।

আমরা ধাতু ও অধাতুদের ভৌতধর্ম জানার জন্য যেমন নানা পরীক্ষা করেছি, এসো তেমনই কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের রাসায়নিক ধর্ম জানার চেষ্টা করি।

ধাতু ও অধাতুগুলিকে বায়ুতে দহন করলে কী ঘটে :

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

(i) ম্যাগনেশিয়াম ফিতা, সালফার গুঁড়ো, (ii) পাতিত জল, (iii) লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, (iv) দুটো 100 mL বিকার, (v) দুটো পোর্সেলিনের বাটি, (vi) একটা কাচের ফানেল, (vii) ত্রিপদ স্ট্যান্ড, (viii) একটা কাচের নল, (ix) একটা কাচদণ্ড (আলোড়ক), (x) কিছুটা রবার নল, (xi) একটা স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প।

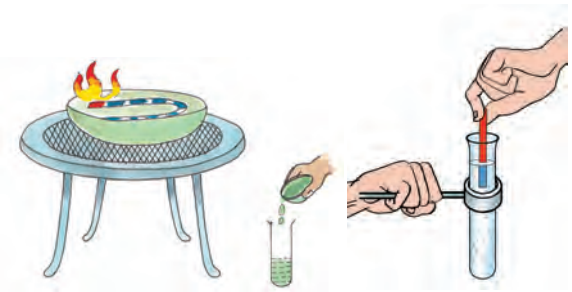

কী করলে	কী দেখলে	লিটমাসের রং দেখে উৎপন্ন অক্সাইডগুলোর প্রকৃতি কেমন বলে মনে হয়
ছবির মতো করে পোর্সেলিনের পাত্রে ম্যাগনেশিয়াম ফিতাকে জ্বালাও। ফিতা জ্বলে নিভে যাবার পর ওই পাত্রে পড়ে থাকা ছাইয়ে পাতিত জল যোগ করো। দ্রবণে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ পর্যায়ক্রমে ডুবিয়ে তাদের রং লক্ষ করো। দ্বিতীয় ছবির মতো করে পোর্সেলিনের পাত্রে সালফার গুঁড়ো নাও। পোর্সেলিনের পাত্রের উপর ফানেলটাকে ছবির মতো করে আটকাও। ফানেলের সরু দিক ও কাচের নল একটা রবার নল দিয়ে যুক্ত করো। কাচ নলের অপর প্রান্ত বিকারে রাখা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। এবার সালফার গুঁড়োকে আগুন দিয়ে জ্বালাও। সালফার পুড়ে যে গ্যাস উৎপন্ন হলো তা কিছুটা জলে দ্রবীভূত হবার পর লাল ও নীল লিটমাস কাগজ পর্যায়ক্রমে ডুবিয়ে তাদের রং লক্ষ করো।	• লাল লিটমাসের বর্ণ ..... • নীল লিটমাসের বর্ণ ..... • লাল লিটমাসের বর্ণ ..... • নীল লিটমাসের বর্ণ	ক্ষারকীয় না আম্লিক ....

কোনো মৌল থেকে উৎপন্ন অক্সাইডের প্রকৃতি থেকেও আমরা মৌলটি ধাতু না অধাতু তা চিনতে পারি। কারণ বেশিরভাগ ধাতব অক্সাইডই ক্ষারকীয় এবং বেশিরভাগ অধাতব অক্সাইডই আম্লিক প্রকৃতির। তবে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) এবং জিঙ্ক অক্সাইডের (ZnO) ক্ষারকীয় ও আম্লিক উভয় গুণই বর্তমান। তাই এদের উভধর্মী অক্সাইড বলে। আবার কার্বন মনোক্সাইডের (CO) মতো কিছু অক্সাইডের আম্লিক বা ক্ষারকীয় কোনো ধর্মই নেই, তারা প্রশম প্রকৃতির।

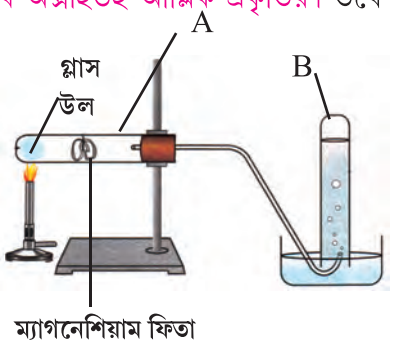

জলের সঙ্গে ধাতু ও অধাতুর বিক্রিয়া

নীচের পরীক্ষা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্য ছাড়া করা যাবে না।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

(i) লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, কার্বন, সালফার, (ii) পাতিত-জল, (iii) গ্লাস উল, (iv)একটা শক্ত কাচের টেস্টটিউব (A), (v) একটা রবারের ছিপি, (vi) একটা কাচের নির্গম নল, (vii) একটা সাধারণ টেস্টটিউব (B), (viii) একটা ক্ল্যাম্প, (ix) একটা স্পিরিট ল্যাম্প

কী করলে	কী দেখলে	কী সিদ্ধান্ত নিলে
• ম্যাগনেশিয়ামের ফিতার টুকরো নিয়ে ছবির মতো করে পরীক্ষা করা হয়। জলে ভেজানো গ্লাসউলকে স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপের ফলে গ্লাসউলে সঞ্চিত জল থেকে উৎপন্ন গরম জলীয় বাষ্প ম্যাগনেশিয়ামের সংস্পর্শে আসে। • গ্যাসটাকে নিয়ে আগুনে ধরা হলো।	• কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যাবে B টেস্টটিউবে বুদবুদ আকারে গ্যাস বেরোচ্ছে যা জলকে সরিয়ে গ্যাসজারে জমা হচ্ছে। • গ্যাসটা আগুনের শিখার সংস্পর্শে এলেই নীলচে শিখায় খুব অল্প সময় শব্দসহ দপ করে একবার জ্বলেই নিভে যায়।	গ্যাসটা কী বলে তোমার মনে হয় ? ....। ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার সমীকরণে শূন্যস্থান পূরণ করে সমতা বিধান করো। $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 +$ _____

জলের সঙ্গে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালশিয়াম, সোনা, রুপো, তামা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি ধাতু এবং কার্বন, সালফার, আয়োডিন প্রভৃতি অধাতু নিয়ে একইভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে —

- সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম ঠান্ডা জলের সঙ্গে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। ওই তাপে ধাতুতে আগুনও লেগে যেতে পারে।
- Ca-এর ক্ষেত্রে ঠান্ডা জলের বিক্রিয়ার তীব্রতা অনেক কম এবং লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক — এরা ঠান্ডা বা গরম জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। কিন্তু লোহা, জিঙ্ক স্টিমের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ধাতব অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।
- সিসা, তামা, সোনা এবং রুপো কোনো অবস্থাতেই জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না।

জলের সঙ্গে ধাতুগুলোর বিক্রিয়াগুলোর সমীকরণে শূন্যস্থান পূরণ করে সমতা বিধান করো :

$Ca + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2$

$3Fe + 4H_2O$(স্টিম) $\longrightarrow Fe_3O_4 +$ _____

$Zn + H_2O$(স্টিম) $\longrightarrow ZnO +$ _____

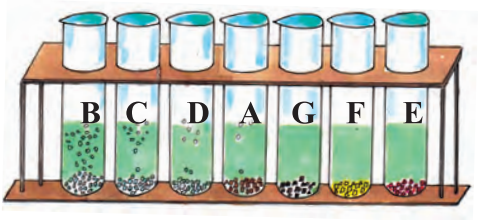

ধাতু ও অধাতুর সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া

প্রয়োজনীয় দ্রব্য

- লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)
- লোহা, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক, তামা প্রভৃতি ধাতু এবং কয়লা, সালফার প্রভৃতি অধাতুর টুকরো

কী করলে	কী দেখলে	কী গ্যাস নির্গত হলো? বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো
7 টা টেস্টটিউব A, B, C, D, E, F, G নাও। প্রত্যেকটার অর্ধেক পর্যন্ত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দাও। এবার A, B, C, D, E, F, G টেস্টটিউবে. যথাক্রমে Fe, Mg, Al, Zn, Cu, S এবং C-এর সম ওজনের খুব ছোটো টুকরো যোগ করো। কোন টেস্টটিউব থেকে গ্যাস নির্গত হলো এবং গ্যাস নির্গত হবার হার লক্ষ করো। গ্যাসটা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং আগুন দিলে একবার নীল শিখায় জ্বলেই শব্দ করে নিভে যায়।	A , B, C ও D টেস্টটিউব থেকে বুদবুদ আকারে গ্যাস নির্গত হলো। E, F এবং G থেকে কোনো গ্যাস নির্গত হলো না। B থেকে সবচেয়ে দ্রুত গ্যাস নির্গত হলো।	নির্গত গ্যাসটি হলো ..... A টেস্টটিউবে যা ঘটছে : $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$ B টেস্টটিউবে যা ঘটছে : Mg + ... → ..... + ... C টেস্টটিউবে যা ঘটছে : Al + ... → ..... + ... D টেস্টটিউবে যা ঘটছে : Zn + ... → ..... + ...

তোমরা আগেই জেনেছ Zn ধাতুর সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক (বা সালফিউরিক) অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জিঙ্কের লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বদলে নাইট্রিক অ্যাসিড নিলে কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে না। এই পরীক্ষা Na বা K নিয়ে করা উচিত নয়। কারণ Na বা K-এর সঙ্গে জল বা অ্যাসিডের বিক্রিয়া এত তীব্র হয় যে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

বিভিন্ন ধরনের ধাতুদের লঘু অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের ক্ষমতা থেকে দেখা যায় সব ধাতুর সক্রিয়তা সমান নয়। হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে ধাতুদের সক্রিয়তার ক্রম নীচে দেওয়া হলো। তালিকার সবচেয়ে বাঁদিকে যে ধাতু আছে সেটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয়।

K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb (H) Cu Hg Ag Au →

সবচেয়ে বেশি সক্রিয় — সবচেয়ে কম সক্রিয়

সক্রিয়তার ক্রম থেকে জানা যায় যারা হাইড্রোজেনের বাঁদিকে আছে তারাই লঘু অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে পারে। আবার তালিকার বাঁদিকে থাকা কোনো মৌল ডানদিকের মৌলের যৌগ থেকে তাকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। যেমন — কপার সালফেট দ্রবণে একটা লোহার পেরেক ডুবিয়ে রাখলে দেখা যাবে যে লোহার পেরেকের গায়ে ধাতব কপারের লালচে বাদামি রঙের একটা আস্তরণ পড়েছে।

$$Fe + CuSO_4 \longrightarrow FeSO_4 + Cu$$

তোমরা ধাতু ও অধাতুর বেশ কিছু ধর্মের কথা জানলে। এবার তোমরা ধাতু ও অধাতুদের তৈরি বিভিন্ন জিনিসের নাম লেখো এবং কোন ক্ষেত্রে ওদের কোন ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা নীচের সারণিতে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমাকে সাহায্য করবেন।

মৌলের নাম	মৌল দিয়ে তৈরি কিছু জিনিসের নাম	এক্ষেত্রে মৌলের কোন ধর্ম মানুষ কাজে লাগিয়েছে	ওই জিনিস কোন কাজে ব্যবহার করা হয়
1. লোহা			
2.তামা বা কপার			
3.অ্যালুমিনিয়াম			
4. সিসা			
5. সোনা	1. গহনা 2. মুদ্রা	1. প্রসারণশীলতা, নমনীয়তা, রং ও উজ্জ্বলতা 2. সাধারণ অবস্থায় সহজে বিক্রিয়া করে না।	1. অলংকার হিসাবে। 2. দ্রব্যাদি আদানপ্রদানের জন্য
6.দস্তা বা জিঙ্ক			
7.কার্বন (গ্রাফাইট)	1. তেল কিংবা জলের সঙ্গে গ্রাফাইট চূর্ণ মিশিয়ে পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 2. পেনসিলের শিস তৈরিতে । 3. উচ্চতাপ সহনকারী মুচি তৈরি করতে। 4. তড়িৎদ্বার তৈরি করতে।	1. উচ্চ গলনাঙ্ক 2. পিচ্ছিলকারক পদার্থ 3. বিদ্যুৎ ও তাপের সুপরিবাহী	

মানবজীবনে ও পরিবেশে ধাতু ও অধাতুর ব্যবহার

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার বয়স কত জানো? প্রায় 450 কোটি বছর। আর পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় 350 কোটি বছর আগে। পৃথিবী সৃষ্টির পর আজ পর্যন্ত নানা সময়ে নানা পরিবর্তন হয়েছে। যেমন — সমুদ্র সৃষ্টি, আবহাওয়ার পরিবর্তন (গরম থেকে ঠান্ডা, তারপর আবার গরম), ঠান্ডা যুগের আবির্ভাব, অপুষ্পক থেকে সপুষ্পক উদ্ভিদের সৃষ্টি, অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিবর্তন। এই বিবর্তনের প্রভাবেই প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার বছর আগে আবির্ভাব হয়েছিল মানুষের। অন্ধকার গুহায় থাকা, অত্যধিক ঠান্ডায় কাঁপা, কাঁচা মাংস ও ফল খাওয়া, কথা বলার ভাষা না জানা, বন্য জন্তুদের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ এবং অসহায়ভাবে নানা রোগে ভুগে মারা যাওয়া — এসবই ছিল তখনকার মানুষের জীবনসংগ্রাম।

তারপর হাজারো বাধাবিপত্তি কাটিয়ে মানুষ আজকের জীবনযাত্রায় পৌঁছোল। মাটি থেকে একখণ্ড পাথর তুলে সে জীবনযাত্রার শুরু, নানা ধাতব ও অধাতব মৌল দিয়ে তৈরি নানা উপকরণ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তার ব্যাপ্তি।

নীচে কতকগুলি যৌগের সংকেত দেওয়া হলো এতে উপস্থিত ধাতু ও অধাতুগুলি শনাক্ত করো:

যৌগের সংকেত	ধাতু ও অধাতুর নাম	যৌগের সংকেত	ধাতু ও অধাতুর নাম
1. $NaCl$		9. $ZnCl_2$	
2. KOH		10. MnO_2	
3. $Pb(NO_3)_2$		11. $CoCl_2$	
4. $Ca(OH)_2$		12. PbO	
5. $MgCl_2$		13. $HgCl_2$	
6. Fe_2O_3		14. As_2O_3	
7. CuO		15. H_3PO_4	
8. $CdCl_2$		16. H_2SO_4	

একজন আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রার দিকে তাকালে এই ধাতু বা অধাতুগুলোর নানা ব্যবহার চোখে পড়ে। একজন আধুনিক মানুষের একটা দিন কীভাবে কাটে?

প্রাত্যহিক জীবনে প্রায় প্রত্যেককেই ধাতু এবং অধাতুর তৈরি নানা উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। পরের পাতার সারণিতে এরকম কিছু ব্যবহার দেখানো হলো।

প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহৃত পদার্থ/বস্তু		প্রধান প্রধান ধাতু এবং অধাতু (যৌগরূপে থাকে)
1.	ইট, সিমেন্ট	অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, অক্সিজেন
2.	কলিচুন	ক্যালশিয়াম,অক্সিজেন, হাইড্রোজেন
3.	স্টেইনলেস স্টিল	লোহা, ক্রোমিয়াম
4.	প্লাস্টিক	কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন,ক্লোরিন
5.	গহনা	রুপা, সোনা, তামা
6.	রাসায়নিক সার	নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম
7.	দাঁত মাজার পেস্ট	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম
8.	ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম	সিলভার, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ব্রোমিন
9.	চেয়ার, টেবিলের কাঠ	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন
10.	দেশলাই কাঠির বারুদ	লাল ফসফরাস, ক্লোরিন, অক্সিজেন, পটাশিয়াম
11.	উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্য	কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন,নাইট্রোজেন, S, P, Na, Ca, Mg, Fe, K
12.	ওষুধ	সালফার, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফ্লুওরিন, সোডিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম

মানুষ যেমন তার নানা কাজে খনিজ মৌল (ধাতু ও অধাতু)-দের ব্যবহার করেছে, তেমনি মানবদেহ গঠন ও তার বিবর্তনের জন্য (করোটি, মেরুদণ্ড, পেশি, রক্ত, নানারকম দেহতরল, ত্বক, চুল, নখ ইত্যাদি) মোট 16টা ধাতব ও অধাতব মৌলগুলোর নানা যৌগ নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখন দেখা যাক মানবদেহের প্রতি 100 গ্রাম ওজনে বিভিন্ন ধাতব ও অধাতব মৌল কী কী পরিমাণে উপস্থিত থাকে।

ধাতুর নাম	উপস্থিতি (শতাংশের হিসেবে)	অধাতুর নাম	উপস্থিতি (শতাংশের হিসেবে)
1. ক্যালশিয়াম	1.43	1. অক্সিজেন	61.42
2. সোডিয়াম	0.14	2. কার্বন	22.85
3. পটাশিয়াম	0.14	3. হাইড্রোজেন	9.99
		4. নাইট্রোজেন	2.57
		5. ফসফরাস	1.11

তাহলে কি এই অনুপাতে মৌলগুলো একজায়গায় যোগ করলেই মানবদেহ তৈরি করা সম্ভব? তোমরা অবশ্যই উত্তর দেবে — কিছুতেই সম্ভব নয়। তার কারণ মৌলগুলো সবসময় জটিল, শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে চলেছে। এই জটিল প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো মৌলের পরিমাণ কম-বেশি হলেই মানবশরীরে নানারকম সমস্যা হতে পারে।

এসো আমরা এবার জেনে নিই পরিপোষক হিসেবে খুব বেশি বা অল্প পরিমাণে কাজে লাগে এমন কতকগুলি মৌল কীভাবে আমাদের শরীরে নানান ভারসাম্য রক্ষা করে বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

1. দেহের জলের ভারসাম্য

দেহের আন্তঃকোশীয় ও বহিঃকোশীয় তরলের প্রধান ক্যাটায়ন হলো Na^+ ও K^+। বহিঃকোশীয় তরলে থাকা সোডিয়াম আয়নের উপস্থিতি অভিস্রবণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী বহিঃকোশীয় ও অন্তঃকোশীয় প্রকোষ্ঠে জলের বন্টনে সাহায্য করে। মূত্র তৈরির সময় জল ধরে রাখে ও তাকে পুনরায় রক্তে পাঠিয়ে রক্তের আয়তন সঠিক রাখতে সাহায্য করে। তাই কাঁচা নুন বেশি খেলে কোশ মধ্যস্থ তরল থেকে রক্ত জল শোষণ করতে শুরু করে ও রক্তে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে হৃৎপিণ্ড ও বৃক্কে নানা বিপত্তি ডেকে আনে। আবার প্রচুর ঘাম কিংবা ডায়ারিয়ার সময় দেহ তরলে Na^+ -এর পরিমাণ কমে গেলে রক্তচাপ হঠাৎ কমে গিয়ে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

2. হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা

হৃৎপেশির উত্তেজিতা ও ছন্দোবদ্ধ সংকোচন-প্রসারণ Ca^{2+} ও K^+-এর গাঢ়ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। K^+-এর গাঢ়ত্ব কমে গেলে হৃৎপিণ্ডের কাজ স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। Ca^{2+} সংকোচনের মাত্রার বল বৃদ্ধি করে। Ca^{2+}-এর গাঢ়ত্ব কমে গেলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের হার কমে যায়।

3. অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য

খাদ্যের মাধ্যমে K^+ গ্রহণ কম হলে ফলে কোশে অম্লত্ব বেড়ে যায় এবং কোশের বাইরের তরলে ক্ষারের পরিমাণ বেড়ে যায়। অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য নষ্ট হলে অস্থিসন্ধির ক্ষয় শুরু হয় (আর্থ্রাইটিস) ও হাড়ের ঘনত্ব কমতে শুরু করে (অস্টিওপোরোসিস)।

4. দাঁত ও হাড় গঠন

দাঁত ও হাড়ের দৃঢ়তা, ভার বহনক্ষমতা এবং কংক্রিটের মতো গঠনের জন্য দায়ী হলো ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস। হাড় ও দাঁতের বিভিন্ন অংশ ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাসের নানা যৌগ দিয়ে তৈরি হয়।

5. উৎসেচকের কার্যকারিতা

খাদ্যনালীতে শর্করা ও লিপিড জাতীয় খাদ্যের পরিপাক করে অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ উৎসেচক (এনজাইম)। আবার হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে সাধারণ তাপমাত্রায় ভেঙে দেয় ক্যাটালেজ উৎসেচক। কোশের মাইটোকনড্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন করতে লাগে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ উৎসেচক। ক্যাটালেজের চাই Fe^{2+}, আবার সাইটোক্রোম অক্সিডেজের কাজে Fe^{2+}, Cu^+ অপরিহার্য। অ্যামাইলেজ উৎসেচক গঠনে Cl^- আয়নের প্রয়োজন।

6. রক্ত জমাট বাঁধা

কোনো আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করলে কয়েক মিনিটের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। রক্ত তঞ্চনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন উপাদানকে সক্রিয় করতে Ca^{2+} গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

7. পেশির সংকোচন ও স্নায়ুস্পন্দন পরিবহণ

পেশি সংকোচনে দুটি প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা হলো অ্যাকটিন ও মায়োসিন। মসৃণ পেশির সংকোচন মায়োসিন নির্ভর ও অমসৃণ পেশির সংকোচন অ্যাকটিন নির্ভর। উভয় প্রকার সংকোচনেই Ca^{2+} গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া পেশির উত্তেজিতা Mg^{2+}, Na^{+} ও K^{+} দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি স্নায়ুকোশ থেকে পরবর্তী স্নায়ুকোশে উদ্দীপনা পরিবহণ Ca^{2+} দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

8. কলাকোশের জারণ-বিজারণ

শ্বাসকার্যের সময় গৃহীত অক্সিজেনকে ব্যবহার করে মাইটোকনড্রিয়ার শক্তি উৎপাদনের সময় যে ইলেকট্রন পরিবহণ ঘটে তার জন্য বহু প্রোটিন প্রয়োজন হয়। এই প্রোটিন গঠনে আয়রন ও সালফার ব্যবহৃত হয়।

9. অক্সিজেন পরিবহণ, সঞ্চয় ও ব্যবহার

হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিন যথাক্রমে রক্তে অক্সিজেন পরিবহণ করে ও ধীরে ধীরে সংকোচনক্ষম লোহিত পেশিতন্তুতে অক্সিজেন সঞ্চয় করে। ওই দুটো প্রোটিনের অন্যতম উপাদান হলো আয়রন। তাছাড়া আয়রন ইলেকট্রন গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে ইলেকট্রন পরিবহণে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে মাইটোকনড্রিয়ার ATP সংশ্লেষ ও জল উৎপাদনের মতো কার্য সম্পন্ন হয়। কপারও নানা উৎসেচক গঠনে অংশ নেয় যারা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।

10. অতিরিক্ত জারণ প্রতিরোধ ও বার্ধক্য আসতে বাধা দেওয়া

কপার, সেলেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্কের বিশেষ বিশেষ জৈব যৌগ বিশেষ বিশেষ ক্ষতিকর যৌগের (যথা সুপার অক্সাইড অ্যানায়ন) ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমিত করে। ফলে ক্যানসার, আর্থ্রাইটিস-এর মতো রোগের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

11. হরমোন গঠন

ডায়াবেটিস রোগ ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে হয়। খাদ্যনালীর সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থি অগ্ন্যাশয়ের কোশে ইনসুলিন হরমোনকে সুস্থিত ও সঞ্চয় করতে Zn^{2+} গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত থাইরক্সিন হরমোন মানবদেহের কোশে কোশে O_2 গ্রহণ, তাপ উৎপাদন-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরক্সিন হরমোন সংশ্লেষে আয়োডিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

12. রক্ত গঠন

অস্থিমজ্জায় রক্তের লোহিত রক্তকণিকার পরিণতি প্রাপ্তিতে ও লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে উপস্থিত অক্সিজেন পরিবহণকারী প্রোটিন হিমোগ্লোবিন তৈরিতে কোবাল্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

13. দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যৌগ গঠন

মানবদেহের বিভিন্ন কোশ, কলা, অঙ্গাণু গঠনে নানা গুরুত্বপূর্ণ যৌগ বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যেমন — ফসফোলিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড, মেটালোপ্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি। এসব যৌগ গঠনে C, H, O, N, P, S-এর মতো অধাতব মৌল এবং Fe, Cu, Se, Mn -এর মতো ধাতব মৌল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ওপরে আমরা জানলাম যে বিভিন্ন ধাতু ও অধাতু মানবদেহ গঠনে ও বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ চালাতে নানা ভূমিকা পালন করে।

আবার কিছু ধাতু ও অধাতু আছে যারা মানবদেহে সহনীয় মাত্রার ওপরে থাকলে নানা রোগের সূচনা করে। মস্তিষ্ক, বৃক্ক, যকৃৎ, জিভ, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, হাড়, ত্বক ইত্যাদি নানা অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এরা দেহে ক্রমাগত প্রবেশ করতে ও জমা হতে থাকলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এরকম ধাতব ও অধাতব মৌলগুলো হলো লেড, মার্কারি, ক্যাডমিয়াম, নিকেল ,অ্যালুমিনিয়াম, ফ্লুওরিন ও আর্সেনিক।

বিভিন্ন উৎস থেকে এই ধাতু ও অধাতুগুলো বা তাদের বিভিন্ন যৌগ মানবদেহে প্রবেশ করে। নীচের সারণিতে এই ধাতু ও অধাতুগুলো যে যে উৎস থেকে মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে তা দেওয়া হলো।

কোন ধাতু/অধাতু বা তার যৌগ	যেসব উৎস থেকে এগুলো মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে
লেড (সিসা)	পেট্রোল, কীটনাশক, রং, লেড পাইপ, লেড ব্যাটারি
পারদ	ব্যাটারি তৈরির কারখানা, মার্কারি ভেপার ল্যাম্প কারখানা, কাগজ শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, থার্মোমিটার, থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের ফ্লাইঅ্যাশ ও ছাই
ক্যাডমিয়াম	ছত্রাকনাশক যৌগ, সুপার ফসফেট সার, মাটি, মানুষের খাদ্য (আলু), তামাক পাতা, খেলনা, সিগারেটের ধোঁয়া, মাছ, সবজি
নিকেল	খাদ্য (চিংড়ি, মার্জারিন, বনস্পতি), সিগারেটের ধোঁয়া, গহনা, শল্যচিকিৎসা
অ্যালুমিনিয়াম	প্রসাধনী দ্রব্য, অ্যান্টাসিডজাতীয় ওষুধ, রান্নার বাসনপত্র, মোড়ক, কাচের কারখানা ইত্যাদি
ফ্লুওরিন	গভীর নলকূপের জল (ফ্লুওরাইড যৌগরূপে), প্লাস্টিক, ওষুধ
আর্সেনিক	অগভীর নলকূপের জল (প্রধানত আর্সেনেট ও আর্সেনাইট যৌগরূপে) , খাদ্য, কীটনাশক, থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের ছাই

তোমাদের অঞ্চলে বা পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে বা অন্যত্র ধাতু বা অধাতুঘটিত কোনো রোগ বা দুর্ঘটনার কোনো কথা তোমার জানা থাকলে সে বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করো।

2.2 পদার্থের গঠন

পরমাণু ও অণুর ধারণা

আজ থেকে প্রায় 2500 বছর আগে প্রাচীন গ্রিসে দার্শনিক লিউসিপ্পাস ও তাঁর ছাত্র ডিমোক্রিটাস বললেন যে কোনো জিনিসকে ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে এক সময় তাকে আর ভাঙা যাবে না। যে অতিক্ষুদ্র কণাকে আর ভাঙা যাবে না ডিমোক্রিটাস তার নাম দিলেন atomos (অ্যাটোমোস)। গ্রিক ভাষায় atomos মানে 'যাকে আর ভাঙা যায় না'। এখান থেকেই atom কথাটা এসেছে। বাংলায় আমরা অ্যাটমকে বলি পরমাণু। লিউসিপ্পাস ও ডিমোক্রিটাস কিন্তু পরমাণুদের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। আরো পরে গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস ও রোমান দার্শনিক লুক্রেশিয়াস ডিমোক্রিটাসের কথাগুলোই বললেন। কিন্তু পরীক্ষা করে পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে ইউরোপ প্রায় ভুলেই গেল লিউসিপ্পাস-ডিমোক্রিটাসের কথা। শুধু গ্রিক দার্শনিকরাই নন, ভারতীয় দার্শনিক কণাদ-ও পরমাণুর অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন।

1660 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি ব্রিটেনে আইজ্যাক নিউটন ও রবার্ট বয়েল কল্পনা করলেন পদার্থ কিছু অতিক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। পরবর্তী প্রায় একশো বছরে ইউরোপে রসায়নবিদরা নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, অক্সিজেন, ফসফরাস-সহ বেশ কিছু মৌল আবিষ্কার করলেন। বিভিন্ন মৌলের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগল। বিক্রিয়াগুলোর ধরনে বেশ কিছু মিলও আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু কেন সেসব ঘটছে তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না।

তারপর কী হলো? 1808 খ্রিস্টাব্দে জন ডালটন তাঁর পরমাণুবাদ (atomic theory) প্রকাশ করলেন। তিনি ধরে নিলেন (1) মৌলের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা হলো পরমাণু (atom) যা সৃষ্টিও করা যায় না ধ্বংসও করা যায় না; (2) একই মৌলের পরমাণুরা ভর ও রাসায়নিক ধর্মে একই রকম ; (3) ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুরা ভর ও ধর্মে আলাদা; (4) রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় বিভিন্ন মৌলের পরমাণুরা পূর্ণসংখ্যার সরলানুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। ডালটনের এই পরমাণুবাদের সাহায্যে তাঁর নিজের ও সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কিছু পরীক্ষার ফলাফল বোঝা সম্ভব হলো। 1811 খ্রিস্টাব্দে অ্যামেদেও অ্যাভোগাড্রো ডালটনের মতবাদের ত্রুটি সংশোধন করলেন। তিনি কল্পনা করলেন মৌলের পরমাণুরা জুড়ে অণু (molecule) তৈরি হতে পারে। বোঝা গেল রসায়নে পরমাণুর ধারণা কাজে লাগবে।

উনবিংশ শতকে রসায়নবিদরা নানান মৌল আবিষ্কার, তাদের রাসায়নিক ধর্মের পরীক্ষানিরীক্ষা, যৌগের সংকেত নির্ণয় - এইসব কাজ করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে রসায়নে পরমাণুর গুরুত্বের কথা বোঝা গেল।

আইজ্যাক নিউটন

জন ডালটন

অ্যামেদেও অ্যাভোগাড্রো

পরমাণু কী দিয়ে তৈরি

আজকে তোমরা অনেকেই হয়তো জেনে ফেলেছ যে পরমাণুকেও ভাঙা যায়। এর মানে হলো ডিমোক্রিটাস থেকে ডালটন পরমাণুকে যেমন অবিভাজ্য কণা বলে ভেবেছিলেন পরমাণু আসলে তা নয়। পরমাণু তৈরি হয় কী দিয়ে? পরমাণু তৈরি হয় প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন এই তিনধরনের আরো ছোট্ট কণা দিয়ে। এদের মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। প্রোটন আর নিউট্রন কিন্তু ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দু-হাজার গুণ ভারী। এরা কবে আবিষ্কৃত হলো জানতে চাও?

1897 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জে. জে. থমসনের পরীক্ষা থেকে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। থমসন অবশ্য 'ইলেকট্রন' নাম দেননি, ইলেকট্রন নাম দিয়েছিলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী জর্জ স্টোনী। ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জবাহী কণা তা বোঝার পর বিজ্ঞানীরা বুঝলেন যে পরমাণুতে নিশ্চয়ই সমপরিমাণ ধনাত্মক চার্জবাহী কণাও আছে। (তা নইলে পরমাণু নিস্তড়িৎ হয় কী করে?) 1913 সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করলেন যে, পরমাণুতে ইলেকট্রনের সমান কিন্তু ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণাও থাকে। 1920 খ্রিস্টাব্দে তিনি এই কণার নাম দিলেন 'প্রোটন'।

আজ আমরা জানি নিউট্রন হলো আধানহীন কণা। 1932 খ্রিস্টাব্দে রাদারফোর্ডের ছাত্র স্যাডউইক পরীক্ষামূলকভাবে নিউট্রন আবিষ্কার করেন।

পরমাণুর মডেল

পরমাণুরা ভীষণ ছোট্ট, কোনোভাবেই তাদের মধ্যের কণাগুলোর কোনটা কোথায় আছে তা সরাসরি দেখা সম্ভব নয়। তবুও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে রাদারফোর্ড পরমাণু সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন —

(1) পরমাণুর মধ্যে বেশিরভাগ জায়গাই ফাঁকা। (2) পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভরই তার মাঝখানে অতি অল্প জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। তিনি এই ভারী অংশের নাম দিলেন নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা কেন্দ্রক। (3) পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যেই তার সমস্ত ধনাত্মক চার্জ সীমাবদ্ধ থাকে। (4) নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো নানান বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। পরমাণু সম্বন্ধে রাদারফোর্ডের এই পরীক্ষালব্ধ ধারণাকেই 'রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল' বলা হয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী নীলস বোর পরমাণু সম্বন্ধে যা বললেন আমরা সেই মডেল অনুসারে হাইড্রোজেন, কার্বন ও অক্সিজেন পরমাণুর চিত্র এঁকেছি।

H

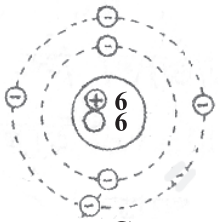

C

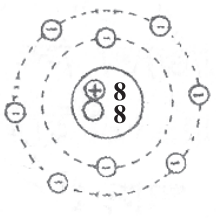

O

এখানে ⊕ দিয়ে প্রোটন, ⊖ দিয়ে ইলেকট্রন ও ◯ দিয়ে নিউট্রন বোঝানো হয়েছে। ছবিতে (+)6 মানে 6টি প্রোটন, ◯ 8 মানে 8টি নিউট্রন... এভাবে বুঝতে হবে। নিউক্লিয়াসে একাধিক প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একসঙ্গে থাকতে পারে। এর কারণ এখানে 'নিউক্লীয় বল' নামে একটি শক্তিশালী আকর্ষণ বল কাজ করে যেটি বিকর্ষণ বল অপেক্ষা অনেক জোরালো।

কোনো মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন সংখ্যাকে তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক (Atomic Number)

বলে। নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে ভরসংখ্যা (Mass Number) বলা হয়।

মৌলের চিহ্নের বাঁদিকে একটু ওপরে ভরসংখ্যা ও বাঁদিকে একটু নীচে পরমাণু ক্রমাঙ্ক লেখা হয়। যেমন নাইট্রোজেন পরমাণুতে 7 টা প্রোটন ও 7 টা নিউট্রন আছে তাই একে লেখা হবে $^{14}_{7}N$।

- আগের পাতার ছবি থেকে বলো কার্বন ও অক্সিজেনের পরমাণু ক্রমাঙ্ক ও ভরসংখ্যা কত। চিহ্নের মাধ্যমে এই তথ্য তুমি কীভাবে প্রকাশ করবে দেখাও।

- নীচে তোমাদের লিথিয়াম,সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্লোরিন পরমাণুর ছবি দেখানো হলো। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরমাণুতে বিভিন্ন কণার সংখ্যা, পরমাণু ক্রমাঙ্ক ও ভরসংখ্যা কত হবে তা নীচের সারণিতে লেখো।

পরমাণু	প্রোটন	ইলেকট্রন	নিউট্রন	পরমাণু ক্রমাঙ্ক	ভরসংখ্যা	মৌলের চিহ্ন
Li						
Na						
Mg						
Cl						

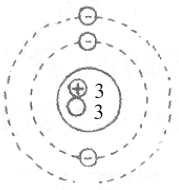

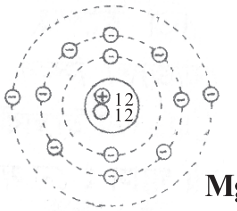

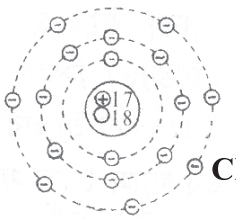

আইসোটোপ ও আইসোবার

যেসব পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা (= পরমাণু ক্রমাঙ্ক) সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন তাদের পরস্পরের আইসোটোপ (Isotope) বলে। উদাহরণ : $^{1}_{1}H$(প্রোটিয়াম), $^{2}_{1}H$(ডয়টেরিয়াম), $^{3}_{1}H$(ট্রিশিয়াম)।

ভিন্ন মৌলের যেসব পরমাণুর ভরসংখ্যা (= নিউট্রনসংখ্যা + প্রোটনসংখ্যা) সমান তাদের পরস্পরের আইসোবার (Isobar) বলা হয়। উদাহরণ : $^{3}_{1}H$ ও $^{3}_{2}He$; $^{14}_{6}C$ ও $^{14}_{7}N$।

আগের পাতায় তোমরা যেসব বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কথা জানলে নীচে তাঁদের ছবি দেওয়া হলো

জোসেফ জে. থমসন

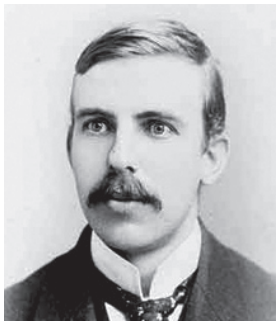

আর্নস্ট রাদারফোর্ড

নীলস বোর

জেমস স্যাডউইক

● পরমাণুরা কত ছোটো?

তোমার জ্যামিতি বক্সের মিলিমিটার স্কেলটা বার করে দেখোতো এক মিলিমিটার জায়গাটা কতটুকু। এই স্কেল দিয়ে সবচেয়ে ছোট্ট কতটুকু দৈর্ঘ্য মাপতে পারবে বলোতো? এক মিলিমিটার, তাই তো? ওই এক মিলিমিটার দৈর্ঘ্য তোমার কাছে কিছুই নয়, কিন্তু একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসের তুলনায় সেটা এক কোটি গুণ বড়ো! তাহলে বোঝা গেল পরমাণুরা কত ছোট্ট হয়?

এবার পরমাণুদের ভরের কথায় আসা যাক। পদার্থবিজ্ঞানীদের সূক্ষ্ম ওজন যন্ত্রে এক মিলিগ্রাম সোনার ওজনও নেওয়া যায়। ওই এক মিলিগ্রাম সোনাতেও প্রায় 3×10^{18} সংখ্যক সোনার পরমাণু আছে। সোনা বেশ ভারী ধাতু, যদি তার চেয়ে হালকা হিলিয়াম পরমাণু হতো? তাহলে এক মিলিগ্রামে থাকত ওর প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশি পরমাণু $(50 \times 3 \times 10^{18})$!

আমরা খালি চোখে কোনো বস্তুর যতটুকু দেখতে পাই, হাতে নিতে পারি, ওজন করতে পারি তাতে বহু কোটি কোটি পরমাণু থাকে। খুব ছোট্ট হলেও পরমাণুদের একটুখানি ভর আর আয়তন আছে, না হলে চোখে দেখার মতো কোনো জিনিসের ভর আর আয়তন থাকত না। কোনো দাঁড়িপাল্লা দিয়েই পরমাণুদের ওজন সরাসরি মাপা যায় না। বিজ্ঞানীরা অনেক অন্য পরীক্ষা থেকে পরমাণুর ভর এবং আয়তন হিসেব করে বার করেছেন। পরমাণু জুড়ে জুড়েই অণু তৈরি হয়। যে-কোনো অণুই হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে বড়ো, কিন্তু তাদেরও চোখে দেখা যায় না। অণুদের ভর বা আয়তনও সরাসরি মাপা যায় না।

● লোহার একটা পরমাণুর চেয়ে সোনার একটা পরমাণুর ভর বেশি। তাহলে এক মিলিগ্রাম লোহা না এক মিলিগ্রাম সোনা—কোথায় বেশি সংখ্যক পরমাণু থাকবে?

● পরমাণুর তুলনায় নিউক্লিয়াস কতটা ছোটো?

নিউক্লিয়াসের ব্যাসের তুলনায় পরমাণুর ব্যাস প্রায় এক লক্ষ গুণ বেশি। এর মানে হলো নিউক্লিয়াসকে যদি এক সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা মার্বেলের মতো বড়ো করে দেখা যেত তাহলে পরমাণুটা হতো একটা মস্ত বড়ো গোলক, যার ব্যাস এক কিলোমিটার!

পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা

● **পদার্থের মধ্যে অণু-পরমাণুরা থাকে কীভাবে?**

তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ বন্ধ ঘরে ধূপ জ্বালালে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ধূপ জ্বালালে কিছু উদবায়ী যৌগ বাষ্প হয়ে বাতাসে মেশে। এইসব যৌগদের কোনো কোনোটার অণুরা যখন আমাদের নাকে ঢোকে তখন আমরা সুগন্ধের অনুভূতি পাই। তাহলে ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার মানে হলো গ্যাস অবস্থায় অণুদের ছড়িয়ে পড়া। একটা কাঁচের গ্লাসে কিছুটা জল নিয়ে তাতে এক ফোঁটা কালি ফেলো। জলটা রেখে দিলে দেখবে রংটা ধীরে ধীরে জলের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। রং নিশ্চয়ই কোনো না কোনো যৌগের অণু দিয়ে তৈরি। তাহলে দেখা গেল তরলের মধ্যে দিয়েও অণুরা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

● **এই দুটো পরীক্ষা থেকে তুমি কী বলতে পারো?**

এথেকে তুমি অন্তত বলতে পারো যে গ্যাসীয় এবং তরল অবস্থায় অণুরা থেমে থাকে না, তাদেরও গতি আছে। কঠিনের ক্ষেত্রে খালি চোখে দেখে বোঝার মতো এমন কোনো পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অণুদের নড়াচড়া বোঝা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে কঠিনের মধ্যেও অণু-পরমাণুরা থেমে থাকে না। কঠিনের মধ্যেও অণু-পরমাণুরা নড়াচড়া করে।

কঠিন : কঠিনের মধ্যে অণু-পরমাণুরা থাকে বেশ সুশৃঙ্খলভাবে, আর পরস্পরের অনেক কাছাকাছি। ছবিতে অণু-পরমাণুরা ঠেসাঠেসি করে আছে বলে মনে হলেও আসলে পাশাপাশি থাকা অণু বা পরমাণুদের মধ্যে কিছুটা ফাঁক থাকে। কঠিনের মধ্যে অণু-পরমাণুরা কিন্তু মোটেই স্থিরভাবে থাকে না। যে যেখানে আছে সেখানে থেকেই কিছুটা কাঁপতে পারে মাত্র। কঠিনের নিজস্ব আয়তন ও আকৃতি আছে।

তরল: তরলের মধ্যে অণুরা কঠিনের মতো ততটা সুশৃঙ্খলভাবে নেই। অণুরা এখন অল্প কিছুদূর যেতে, কাঁপতে আর পাক খেতে পারে। কঠিনের চেয়ে তরলের মধ্যে অণুদের মধ্যে দূরত্ব একটু বেশি। অণুদের চলাচলের স্বাধীনতা কঠিনের চেয়ে একটু বেশি তাই তরলের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই, যদিও নিজস্ব আয়তন আছে।

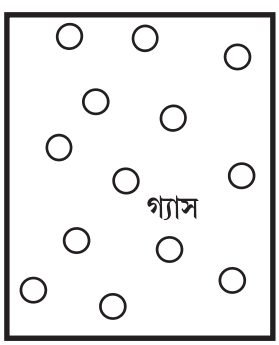

গ্যাস : গ্যাস হলো প্রায় বাঁধনছাড়া অবস্থা — অণুরা পরস্পরের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, আর অনেক জোরে দৌড়োচ্ছে,কাঁপছে আর পাক খাচ্ছে। অণুদের দৌড়োদৌড়ির কোনো নির্দিষ্ট দিক্ নেই, একেবারেই এলোমেলো গতি। দৌড়োতে দৌড়োতে অণুরা একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, ছিটকে সরে যাচ্ছে, পাত্রের দেয়ালে গিয়েও ধাক্কা দিচ্ছে। এই অবিশ্রান্ত গতির জন্যই গ্যাসের কোনো নির্দিষ্ট আয়তন বা আকৃতি নেই।

টুকরো কথা

পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন : উষ্ণতা বাড়লে পদার্থের যে-কোনো অবস্থাতেই অণু-পরমাণুদের গতিশক্তি বাড়ে। তাহলে দেখা যাক কোনো কঠিন বা তরলের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়াতে থাকলে কী ঘটবে।

কঠিনের উষ্ণতা বৃদ্ধি : কঠিনের মধ্যে অণু-পরমাণুরা যেকোনো উষ্ণতাতেই কাঁপে। কঠিনকে গরম করতে থাকলে অণু-পরমাণুদের কম্পনের মাত্রা এবং গতিশক্তিও বাড়ে। এক সময় সেই কম্পন এতই বেড়ে যায় যে অণু-পরমাণুদের আর কঠিন অবস্থায় ধরে রাখা যায় না। কঠিন তখন গলে গিয়ে তরল তৈরি হয়। এই পরিবর্তনকে বলে গলন (melting)।

তরলের উষ্ণতা বৃদ্ধি: তরলকে গরম করতে থাকলে তরলের অণুদের গতিশক্তি বাড়তে থাকে। এক সময় অণুদের গতিশক্তি এতই বেড়ে যায় যে অণুদের মধ্যে আকর্ষণ বল আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। তরল ফুটে তখন বাষ্প তৈরি হয়। এই পরিবর্তনকে আমরা বলব স্ফুটন (Boiling)।

কোনো কোনো কঠিন পদার্থকে খোলা হাওয়ায় গরম করলে তরল অবস্থাটা পাওয়া যায় না। খোলা হাওয়ায় গরম করা হলে এরা সরাসরি বাষ্প হয়ে যায়। এই জাতীয় পদার্থ হলো কর্পূর, আয়োডিন, ন্যাপথালিন, কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি। কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্প হওয়াকে বলে উর্ধ্বপাতন (Sublimation)। উপযুক্ত উষ্ণতায় খুব কম চাপে রাখলে বরফেরও উর্ধ্বপাতন ঘটে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। কর্পূর, আয়োডিন, ন্যাপথালিন, কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড খোলা হাওয়ায় উর্ধ্বপাতিত হয় মানে কখনোই এদের তরল অবস্থায় পাওয়া যায় না,তা কিন্তু নয়—উপযুক্ত উষ্ণতা ও চাপে এইসব পদার্থের তরল অবস্থা পাওয়া যেতে পারে।

কঠিন আর তরলের উষ্ণতা বাড়াতে থাকলে কী ঘটে তা তোমরা জানলে। কিন্তু যদি আমরা গ্যাসের উষ্ণতা আরও বাড়াতে থাকি তখন কী ঘটবে? খুব বেশি উষ্ণতায় গ্যাসের অণুরা ভেঙে পরমাণু হয়ে যাবে, তারপর এক সময় পরমাণু ছেড়ে ইলেকট্রনরাও আলাদা হয়ে যাবে। নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল তখন আর পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনদের ধরে রাখতে পারবে না। এই যে প্রচণ্ড গরম গ্যাসীয় অবস্থা যার মধ্যে আলাদা আলাদা হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে পরমাণুর নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রন— একে বলা হয় প্লাজমা (Plasma)। প্লাজমাকে বলা যেতে পারে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। সূর্য এবং তারাদের উপাদান হলো এই উত্তপ্ত প্লাজমা। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন সূর্যের কেন্দ্রে এই প্লাজমার উষ্ণতা প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশে তোমাদের সূর্যের বাইরের দিকের ছবি দেখানো হলো।

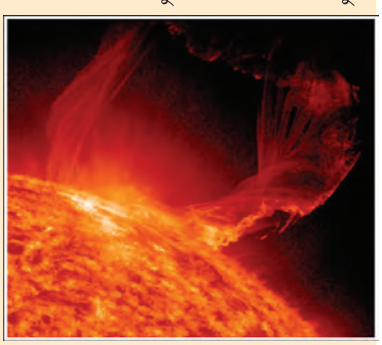

আমাদের চেনা অনেক যৌগ — নুন, পোড়াচুন, কস্টিক সোডা, কলিচুন, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট — এরাও কঠিন পদার্থ। এরা কিন্তু অণু দিয়ে তৈরি নয়। এইসব যৌগ তৈরি হয় আয়ন দিয়ে। পরবর্তী অংশে আমরা আয়ন দিয়ে তৈরি যৌগদের কথা জানব।

যোজ্যতা ও রাসায়নিক বন্ধন

আয়নীয় যৌগ

তোমরা সকলেই নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখেছ। প্রথম ছবির নুনের একটা দানাকে যদি অনেকটা বড়ো করে দেখানো যায় তাহলে কী রকম দেখাবে? নীচের দ্বিতীয় ছবিটা দেখো—

দ্বিতীয় ছবিতে যে বেশ সুন্দর জ্যামিতিক আকৃতির নুনের দানাটাকে দেখা যাচ্ছে তাকে বলে কেলাস বা ক্রিস্টাল (Crystal)। নুন তো আমরা বাজার থেকে কিনে আনি। কিন্তু যদি আমরা পরীক্ষাগারে নুন তৈরি করতে চাই? তাহলে ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে ক্লোরিন গ্যাসের বিক্রিয়া ঘটাতে হবে। বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো:

$$\underset{\text{কঠিন}}{2Na} + \underset{\text{গ্যাস}}{Cl_2} \longrightarrow \underset{\text{কঠিন}}{2NaCl}$$

নুন তৈরিতে কী কী মৌল লাগে সে তো জানা গেল। এবার আমরা জানতে চাইব নুনের ওই ক্রিস্টালে কী থাকে। তার আগে নুনের একটা ধর্মের কথা জেনে নেওয়া যাক।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে প্রায় 800^0C তাপমাত্রায় নুনকে গলিয়ে তরল করে ফেলা যায়। গলে যাওয়া নুনের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠানো সম্ভব। ধাতুর মতো অতো ভালো পরিবাহী না হলেও গলে-যাওয়া নুনের মধ্যে দিয়ে বেশ ভালোভাবেই বিদ্যুৎ যেতে পারে। কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যেতে হলে কোনো-না-কোনো আধানযুক্ত কণাকে যেতেই হবে। যেমন ধরো, ধাতুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাওয়া মানে ইলেকট্রন চলাচল। তাহলে কী গলে-যাওয়া সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল ইলেকট্রনের মাধ্যমে ঘটে? — না; ইলেকট্রন চলাচল নয়; তাহলে?

এই বইয়ের 'স্থির তড়িৎবল ও আধানের ধারণা' অংশে তোমরা জেনেছো যে, কোনো পরমাণু ইলেকট্রন নিলে বা ছেড়ে দিলে কী হয়। সেক্ষেত্রে মোট প্রোটন সংখ্যা আর ইলেকট্রন সংখ্যার সমান থাকে না; পরমাণু তখন তড়িৎযুক্ত হয়ে পড়ে। তড়িৎযুক্ত পরমাণুকে বলে আয়ন(ion)। আয়ন দু-ধরনের —ধনাত্মক আয়ন (ক্যাটায়ন) আর ঋণাত্মক আয়ন (অ্যানায়ন)। তাহলে কী গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ পরিবাহিতা তড়িতের প্রভাবে আয়নদের চলাচলের জন্যে?

— হ্যাঁ। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে কঠিন কেলাসে, গলে-যাওয়া অবস্থায় এবং জলীয় দ্রবণে সবসময়েই নুনের উপাদান হলো Na^+ আর Cl^- আয়ন। বিদ্যুৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করলে এই তড়িৎগ্রস্ত আয়নরাই সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলিত অবস্থায় বা, জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পরিবহণ করে।

এবারে আমরা দেখব কীভাবে সোডিয়াম পরমাণু থেকে Na^+ আর ক্লোরিন পরমাণু থেকে Cl^- আয়ন তৈরি হয়।

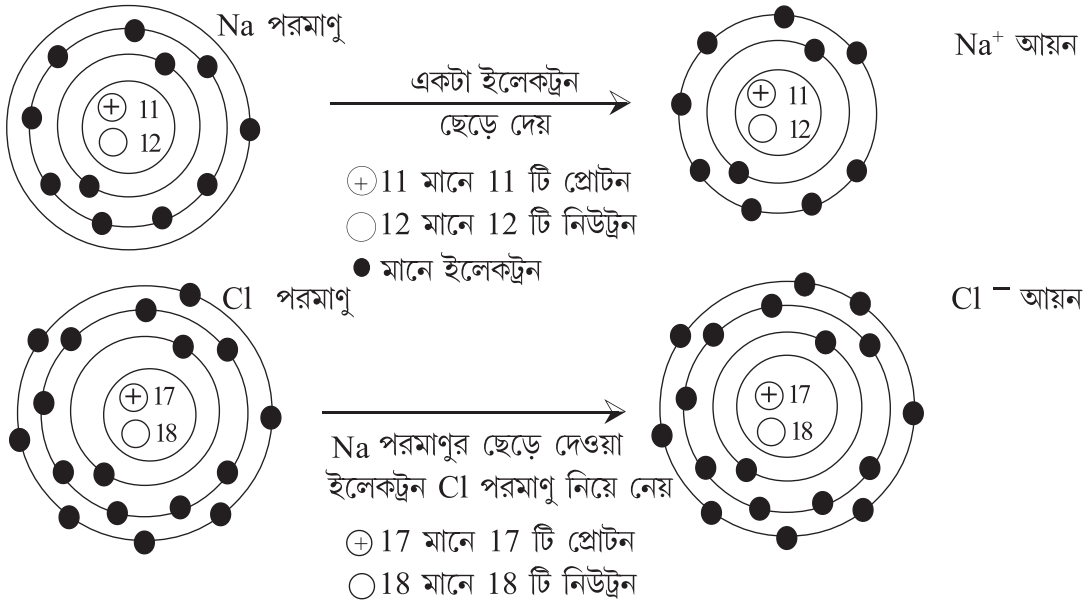

Na^+ আর Cl^- তো তৈরি হলো; কিন্তু কতগুলো আয়ন হয়েছে? শুধু দুটো আয়নই কী?

না; তোমরা জেনেছ যে চোখে দেখতে পাবার মতো যে-কোনো বিক্রিয়ায় বহু লক্ষ কোটি অণু-পরমাণু অংশগ্রহণ করে। এখানেও তাই হয় ; আমরা তোমাদের বিষয়টা সহজে বোঝাতে একটা Na^+ আর একটা Cl^- আয়নের মডেল দেখিয়েছি। আসলে কিন্তু বহু কোটি Na^+ আর সমসংখ্যক Cl^- আয়ন দিয়ে ওই ক্রিস্টালটা তৈরি হয়েছে। বিপরীত আধানযুক্ত আয়নদের মধ্যে তাড়িতিক আকর্ষণই আয়নদের একত্রে ধরে রাখে।

নীচে তোমাদের NaCl ক্রিস্টালের মধ্যে Na^+ আর Cl^- আয়নগুলো কেমনভাবে থাকে তার একটা মডেল দেখানো হলো।

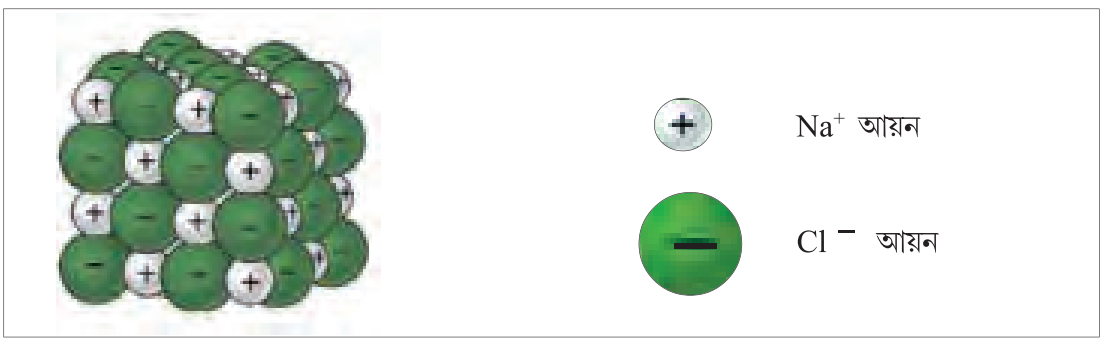

সোডিয়াম ক্লোরাইড হলো একটা ধাতু (Na) আর একটা অধাতুর (Cl_2) যৌগ। ধাতু ও অধাতু দিয়ে তৈরি আরো বহু যৌগই ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন দিয়ে তৈরি বলে প্রমাণ আছে। এদের বলা হয় আয়নিক যৌগ (ionic compound)। যেসব আয়নিক যৌগ জলে দ্রাব্য হয় তাদের জলীয় দ্রবণ তড়িতের পরিবাহী হয়।

আমরা এবার আরো কিছু আয়নিক যৌগের সংকেত লেখার বিষয়টা শিখব। এখানে দুটো কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যা পাশের পাতায় বলা হলো।

(1) কোনো আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে অণুর অস্তিত্ব নেই। তাই আমরা বলব NaCl, $CaCl_2$ ইত্যাদি হলো এইসব যৌগের সংকেত।

(2) যৌগ তৈরির সময় ক্যাটায়নদের মোট পজিটিভ চার্জ আর অ্যানায়নদের মোট নেগেটিভ চার্জ সমান হতেই হবে। এর মানে হলো যৌগে কোনো বাড়তি (+) বা (−) চার্জ থাকা চলবে না।

এবার আমরা নীচের সারণির ফাঁকা জায়গাগুলো পূরণ করব।

ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	মোট চার্জ শূন্য হলো কীভাবে	যৌগের সংকেত	যৌগের নাম
Na^+	Cl^-	প্রত্যেক Na^+ -এর জন্য 1টি Cl^- আয়ন	$(+1)+(-1)=0$	NaCl	সোডিয়াম ক্লোরাইড
K^+	F^-	প্রত্যেক K^+ -এর জন্য — টি F^- আয়ন	_____	_____	পটাশিয়াম ফ্লুওরাইড
Mg^{2+}	O^{2-}	প্রত্যেক Mg^{2+} -এর জন্য 1 টি O^{2-} আয়ন	$(+2)+(-2)=0$	MgO	ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড
Zn^{2+}	S^{2-}	প্রত্যেক Zn^{2+} -এর জন্য — টি S^{2-} আয়ন	_____	_____	জিঙ্ক সালফাইড
Ca^{2+}	Cl^-	প্রত্যেক Ca^{2+} -এর জন্য 2 টি Cl^- আয়ন	$(+2)+2\times(-1)=0$	$CaCl_2$	ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড
Na^+	O^{2-}	প্রতি দুটি Na^+ -এর জন্য --- টি O^{2-} আয়ন	_____	_____	সোডিয়াম অক্সাইড
Al^{3+}	O^{2-}	প্রতি দুটি Al^{3+} -এর জন্য 3 টি O^{2-} আয়ন	$2\times(+3)+3\times(-2)=0$	_____	অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড

. এবার তোমরা এই সারণির সাহায্য নিয়ে নীচের আয়নীয় যৌগদের সংকেত লেখো- অ্যালুমিনিয়াম ফ্লুওরাইড, জিঙ্ক অক্সাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালশিয়াম অক্সাইড, সোডিয়াম সালফাইড।

আগের পাতার যেসব ধাতুর যৌগের কথা বলা হলো তারা একরকমের ক্যাটায়ন দেয়। আরো কিছু ধাতুর কথা আমরা জানব যারা একাধিক রকমের ক্যাটায়ন দেয়। এইরকম চারটে ধাতুর নাম হলো লোহা (Fe), তামা(Cu), মার্কারি (Hg) এবং টিন (Sn)। এইসব ধাতুর কম চার্জের আয়নের নামে 'আস্' ও বেশি চার্জের আয়নের নামে 'ইক' যোগ করে চার্জ কম-বেশির ব্যাপারটা বোঝানো হয়। নীচের সারণি দেখো। লক্ষ করো মারকিউরাস আয়ন হলো Hg_2^{2+} অর্থাৎ এখানে দুটো Hg পরমাণু পরস্পর যুক্ত থাকে।

মৌল	কম চার্জের আয়ন ও তার নাম	বেশি চার্জের আয়ন ও তার নাম
Fe	Fe^{2+}, ফেরাস	Fe^{3+} ফেরিক
Cu	Cu^{+}, কিউপ্রাস	Cu^{2+}, কিউপ্রিক
Hg	Hg_2^{2+}, মারকিউরাস	Hg^{2+}, মারকিউরিক
Sn	Sn^{2+}, স্ট্যানাস	Sn^{4+}, স্ট্যানিক

এবার তোমরা আগের মতো উপায়ে নীচের সারণি পূরণ করো

যৌগের নাম	ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	চার্জের হিসেব	যৌগের সংকেত
ফেরাস ক্লোরাইড	Fe^{2+}	Cl^{-}	প্রত্যেক Fe^{2+} -এর জন্য 2 টি Cl^{-} আয়ন	$(+2)+2\times(-1)=0$	$FeCl_2$
ফেরিক ক্লোরাইড	Fe^{3+}	Cl^{-}	_____	_____	_____
কিউপ্রাস অক্সাইড	Cu^{+}	O^{2-}	প্রতি দুটি Cu^{+} -এর জন্য 1 টি O^{2-} আয়ন	$2\times(+1)+(-2)=0$	Cu_2O
কিউপ্রিক অক্সাইড	Cu^{2+}	O^{2-}	_____	_____	_____
মারকিউরাস ক্লোরাইড	Hg_2^{2+}	Cl^{-}	প্রত্যেক Hg_2^{2+} -এর জন্য 2 টি Cl^{-} আয়ন	_____	_____

এবার তোমরা উপরের সারণি দুটি কাজে লাগিয়ে পাশের যৌগদের সংকেত লেখো: কিউপ্রাস ক্লোরাইড, ফেরিক অক্সাইড, মারকিউরিক অক্সাইড, স্ট্যানাস ক্লোরাইড।

মূলক:

আমরা এতক্ষণ যেসব ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নদের কথা জেনেছি তাদের মধ্যে Hg_2^{2+} ছাড়া সবকটাই এক -পরমাণুক। অ্যানায়ন বা ক্যাটায়ন যে সবসময়েই এক-পরমাণুক হবে তা নয়। একাধিক পরমাণু জোটবদ্ধ হয়ে যে আয়ন তৈরি করে তাকে বলা হয় মূলক বা র‍্যাডিক্যাল (Radical)। নীচের সারণিতে কয়েকটি মূলকের নাম ও সংকেত বলা হলো।

মূলক	সংকেত	মূলক	সংকেত
অ্যামোনিয়াম	NH_4^+	হাইড্রক্সাইড	OH^-
নাইট্রেট	NO_3^-	বাইকার্বনেট	HCO_3^-
কার্বনেট	CO_3^{2-}	ফসফেট	PO_4^{3-}
সালফেট	SO_4^{2-}	সালফাইট	SO_3^{2-}

এবার আমরা আগের এবং উপরের সারণি কাজে লাগিয়ে কিছু যৌগের সংকেত লেখা শিখব।

যৌগের নাম	ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	চার্জের হিসেব	যৌগের সংকেত
ফেরাস সালফেট	Fe^{2+}	SO_4^{2-}	প্রত্যেক Fe^{2+} -এর জন্য 1 টি SO_4^{2-} আয়ন	$(+2)+(-2)=0$	$FeSO_4$
অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেট	Al^{3+}	NO_3^-	প্রত্যেক Al^{3+}-এর জন্য --- টি NO_3^- আয়ন	————	————
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	NH_4^+	NO_3^-	প্রত্যেক NH_4^+ -এর জন্য 1টি NO_3^- আয়ন	$(+1)+(-1)=0$	NH_4NO_3
ক্যালশিয়াম ফসফেট	Ca^{2+}	PO_4^{3-}	প্রতি 3টি Ca^{2+} -এর জন্য 2 টি PO_4^{3-} আয়ন	$3\times(+2)+2\times(-3)=0$	$Ca_3(PO_4)_2$

এবার তোমরা নীচের যৌগগুলোর সংকেত লেখো : অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, ফেরিক সালফেট, কিউপ্রিক নাইট্রেট, ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট, ক্যালশিয়াম বাইকার্বনেট, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালশিয়াম সালফাইট।

মনে রেখো : সারণিতে প্রত্যেক Ca^{2+}-এর জন্য 2টি Cl^- জাতীয় কথা হলো আনুপাতিক হিসেবের কথা। এরা সকলেই আয়নীয় যৌগ, অণু দিয়ে তৈরি নয়। সেই কারণেই সংকেত লেখার সময় আনুপাতিক হিসেবের কথা বলতে হচ্ছে।

সমযোজী যৌগ

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা বেশ কিছু যৌগের কথা জেনেছ। এদের মধ্যে যেমন ধাতুর যৌগ ছিল তেমনই ছিল অধাতুদের যৌগ। অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা ধাতুদের কিছু যৌগের সংকেত লেখার বিষয়টি শিখলে। এই যৌগগুলো হলো আয়নীয় যৌগ। আয়নীয় যৌগদের বৈশিষ্ট্য হলো (i) তারা আয়ন দিয়ে তৈরি (ii) সেখানে অণুর কোনো প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তোমরা নাম শুনেছ এমন অনেক পদার্থই এই শ্রেণিতে পড়ে না — এরা (i) আয়ন দিয়ে তৈরি নয়, এবং (ii) এদের অণুর অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এইসব পদার্থের মধ্যে আছে —

তোমার সবচেয়ে চেনা তরল	—	জল (H_2O)
কিছু মৌলিক গ্যাস	—	হাইড্রোজেন (H_2), নাইট্রোজেন (N_2), ক্লোরিন (Cl_2)
কিছু গ্যাসীয় যৌগ	—	মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), ফসফিন (PH_3), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)

এই অনুচ্ছেদে আমরা এইসব অণুদের অনেকের গঠনের কথা জানব। এইসব অণুদের মধ্যে সবচেয়ে সরল হলো হাইড্রোজেন অণু। তাই প্রথমে আমরা জানব কী করে হাইড্রোজেন অণু তৈরি হয়।

কী করে হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়ে হাইড্রোজেন অণু তৈরি হয়:

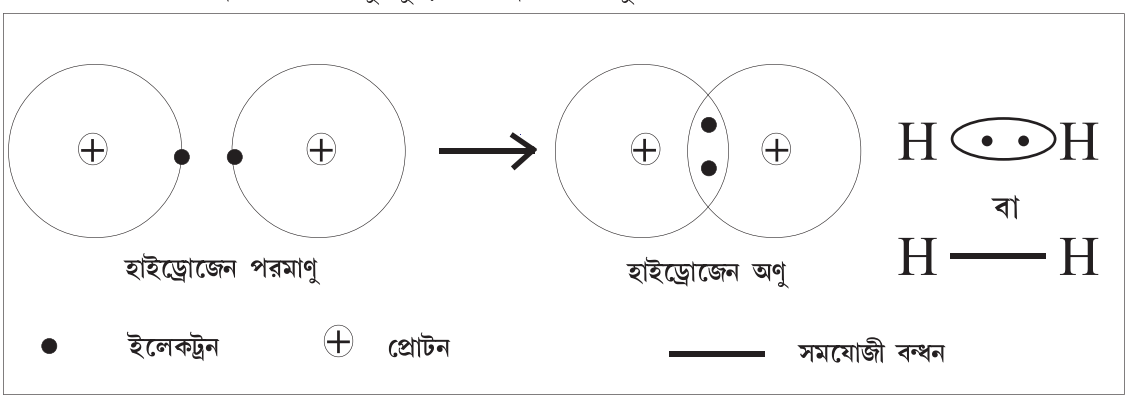

এই ছবিতে বোঝানো হয়েছে যে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু যখন যুক্ত হয়ে H_2 অণু তৈরি করে তখন প্রত্যেকের 1টা করে ইলেকট্রন মিলে একটা ইলেকট্রন জোড় গঠিত হয়। এই ইলেকট্রন জোড়কে ছবিতে ⬭ বা — দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ইলেকট্রন জোড়টা দুটো H পরমাণুর নিউক্লিয়াস দিয়েই সমানভাবে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ দুটো পরমাণুই ইলেকট্রন জোড়টা সমানভাবে ব্যবহার করে। এই কথাটাকে আমরা বলি 'সমযোজী বন্ধন' (covalent bond) গঠিত হওয়া। তাহলে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটা হাইড্রোজেন অণু তৈরির বিষয়টা বোঝা গেল।

তোমরা আগে যোজ্যতা বিষয়ে যা পড়েছ তার সঙ্গে এই লেখার সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছ কি? 'হাইড্রোজেন সাপেক্ষে মৌলের যোজ্যতা' প্রসঙ্গে তোমরা জেনেছিলে যে হাইড্রোজেনের যোজ্যতা 1। এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা H পরমাণু একটাই H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ক্লোরিন সাপেক্ষে মৌলের যোজ্যতার কথাও তোমরা জেনেছ।

যখন দুই বা তিনধরনের মৌলের দুইয়ের বেশি পরমাণু একত্রিত হয়ে সমযোজী অণু গঠন করে তখন তাদের মধ্যে সাধারণত সব মৌলেরই যোজ্যতা সমান হয় না। সেক্ষেত্রে অণুর মধ্যে যে মৌলের যোজ্যতা বেশি নিশ্চয়ই সেই মৌলের পরমাণু মাঝখানে ও অন্যান্য মৌলের পরমাণুরা তার চারপাশে থাকবে। এই মধ্যবর্তী পরমাণুকে বলা যেতে পারে কেন্দ্রীয় পরমাণু । এই নিয়ম মনে রাখলে তোমরা সহজেই কিছু সমযোজী যৌগের অণুর গঠন প্রাথমিকভাবে কীরকম হবে তা বলতে পারবে। এখানে একটা '—'এর অর্থ একটা বন্ধন বা বন্ড (Bond)। একটা বন্ড মানে একজোড়া ইলেকট্রন—এইভাবে বুঝতে হবে।

নীচের সারণিতে তোমাদের বেশ কিছু সমযোজী যৌগের অণুর গঠন প্রাথমিকভাবে কীরকম তা বোঝানো হলো। মিল লক্ষ করে তোমরা সারণি পূরণ করলে অপেক্ষাকৃত সহজে বিষয়টি বুঝতে পারবে।

সারণি

যৌগের নাম	যৌগের সংকেত	কোন মৌলের যোজ্যতা কত	কেন্দ্রীয় পরমাণু	কেন্দ্রীয় পরমাণুর যোজ্যতা	অণুর প্রাথমিক গঠন	অণুতে কটি সমযোজী বন্ধন আছে
জল	H_2O	O 2, H 1	O	2	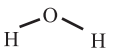	2টি
হাইড্রোজেন সালফাইড	H_2S	S 2, H 1	S	2	.....	__টি
অ্যামোনিয়া	NH_3	N 3, H 1	N	3	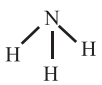	__টি
ফসফিন	PH_3	P 3, H 1	P	3	.....	__টি
মিথেন	CH_4	C 4, H 1	C	4	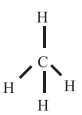	__টি
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড	CCl_4	C 4, Cl 1	C	4	.....	__টি
নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড	NCl_3	N 3, Cl 1	N	3	.....	__টি
ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড	PCl_3	P 3, Cl 1	P	3	.....	__টি

এই পদ্ধতিতে অণুতে কেন্দ্রীয় পরমাণুর বন্ধনসংখ্যার সাহায্যে অণুর প্রাথমিক গঠন কী হবে তা বার করা যায়। কিন্তু অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন কেমন হবে তা বলা যায় না। এছাড়াও এই পদ্ধতির আরো সীমাবদ্ধতা আছে।

2.3 রাসায়নিক বিক্রিয়া

রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবক

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থদের বলে 'বিক্রিয়ক'। রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে হলে বিক্রিয়কদের মিশতে দিতেই হবে, কিন্তু শুধু মিশতে দিলেই কী সবসময় বিক্রিয়া ঘটা শুরু হয়? নীচের ঘটনাগুলো দেখো

(1) কেরোসিন বা কয়লা পুড়তে অক্সিজেন চাই। কিন্তু খোলা হাওয়ায় কেরোসিন বা কয়লা কী নিজে নিজে জ্বলে ওঠে?

(2) যথেষ্ট জল, হাওয়ার কার্বন ডাইঅক্সাইড, মাটির খনিজ— সব পেলেও একটা টবের গাছ অন্ধকারে খাদ্য তৈরি করতে পারবে কী?

(3) খেলনা বন্দুকের ক্যাপ কী রেখে দিলেই ফেটে যায়, না, জোরে আঘাত করতে হয়?

এবার তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে শুধু মিশতে পেলেই বিক্রিয়া হবে না; কোথাও গরম করতে বা আগুন জ্বালাতে হবে, কোথাও বা আলো চাই। কোথাও বেশি চাপ দিতে হয়, কোথাও দ্রাবকও দরকার।

তাপ : উপযুক্ত উষ্ণতা না থাকায় অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়াই শুরু হতে পারে না। যে-কোনো জ্বালানি পোড়াতে হলে তাই যথেষ্ট অক্সিজেন থাকলেই হবে না, উষ্ণতা বাড়াতে হবেই।

পরীক্ষা: জলযুক্ত কিউপ্রিক নাইট্রেটের বিয়োজন বিক্রিয়ার ওপর তাপের প্রভাব

পরীক্ষা	কী দেখবে	কী বুঝবে
দুটো টেস্টটিউবে জলযুক্ত কিউপ্রিক নাইট্রেটের নীল ক্রিস্টাল রাখা হলো।		
একটা টিউব ঘরের উষ্ণতায় রইল	ঘরের উষ্ণতার ক্রিস্টাল-গুলোর কিছু হলো না।	
অন্যটা স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে গরম করা হলো	গরম করলে নীল ক্রিস্টাল কালো গুঁড়োয় পরিণত হচ্ছে, বাদামি ধোঁয়া বেরোচ্ছে।	

বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো : $2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2\ CuO + 4NO_2 + O_2$

বাদামি গ্যাস

বিক্রিয়া শুরু করতে শক্তি প্রয়োজন। উষ্ণতা বাড়লে অণুদের গতিশক্তি বাড়ে, তখন বেশিরভাগ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাড়াতাড়ি।

আলো: সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সবুজ উদ্ভিদ ও কিছু ব্যাকটেরিয়া সূর্যের আলোর শক্তিকে খাদ্যের রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে। সরলীকৃত সমীকরণটি হলো:

$$6CO_2 + 6H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

সালোকসংশ্লেষ একটা অতি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া। আলোর অনুপস্থিতিতে তা শুরু হতে পারে না।

ফোটো তোলার ফিল্ম আলো পড়লে নানান বিক্রিয়া ঘটে, ফলে ফিল্ম কালো হয়ে যায়। কালো কাগজে মোড়া ফিল্ম কিন্তু এভাবে নষ্ট হয় না।

আলোর মাধ্যমেও কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হতে পারে। আলোই এসব ক্ষেত্রে বিক্রিয়া শুরু করতে প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়।

- ছবি তোলার দোকানে (স্টুডিয়ো) 'ডার্ক রুম' (Dark Room) থাকার দরকার কী?

চাপ: খেলনা বন্দুকের ক্যাপকে জোরে আঘাত করলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে শব্দ, তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় চাপের ভূমিকা কী? — এই ক্ষেত্রে খুব জোরে আঘাত করে (অর্থাৎ ক্যাপের উপর চাপ বাড়িয়ে) আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দিচ্ছি।

দ্রাবক : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রাবক যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে নীচের পরীক্ষাটা করো। তোমার লাগবে দুটো টেস্টটিউব, শুকনো খাবার সোডা ($NaHCO_3$), টারটারিক অ্যাসিডের ক্রিস্টাল আর জল।

পরীক্ষা	কী দেখবে	কী বুঝবে
টেস্টটিউবে শুকনো খাবার সোডা আর টারটারিক অ্যাসিডের ক্রিস্টাল মিশিয়ে টেবিলে রাখা হলো	কোনো বুদবুদ বেরোয় না	
টেস্টটিউবে শুকনো খাবার সোডা আর টারটারিক অ্যাসিডের ক্রিস্টাল মিশিয়ে জল দেওয়া হলো	দ্রুত বুদবুদ বেরোতে থাকে	

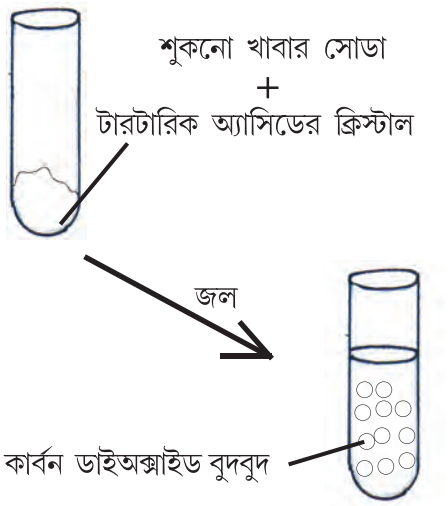

জল একটা তরল যা দ্রাবকরূপে কাজ করছে। দুটো কঠিনের গুঁড়োকে মেশালেই তাদের অণু বা আয়নরা পরস্পর মেশবার সুযোগ পায় না। দ্রাবকের অণুরা এসে বিক্রিয়কের মধ্যে থাকা অণু বা আয়নদের আলাদা করে ফেলে, তখন বিক্রিয়া শুরু হয়।

জলই একমাত্র দ্রাবক নয়। নানা কাজে কেরোসিন, বেঞ্জিন, তারপিন তেলও দ্রাবকরূপে ব্যবহার করা হয়।

- খাবার সোডা আর টারটারিক অ্যাসিডের পরীক্ষায় টেস্টটিউবে জল না দিয়ে খানিকটা কেরোসিন বা বেঞ্জিন দিয়ে ঝাঁকালে কোনো বুদবুদ বেরোতে দেখা যায় না। কেন এমন হয়?

খাবার সোডা আয়নীয় যৌগ। কেরোসিন, বেঞ্জিন বা তারপিন তেলের মতো দ্রাবক আয়ন দিয়ে তৈরি জিনিসকে দ্রবীভূত করতে পারে না। আবার টারটারিক বা অন্য অ্যাসিডকে বিক্রিয়া করতে হলে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) দিতেই হবে। সেই ঘটনা জলে ঘটতে পারে, কেরোসিন, পেট্রোল বা তারপিন তেলের মতো দ্রাবকে ঘটবে না। তাই বিক্রিয়া শুরুই হবে না।

নীচের ছবিতে জলের উপস্থিতিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টালের ক্রমশ দ্রবীভূত হওয়া বোঝানো হলো

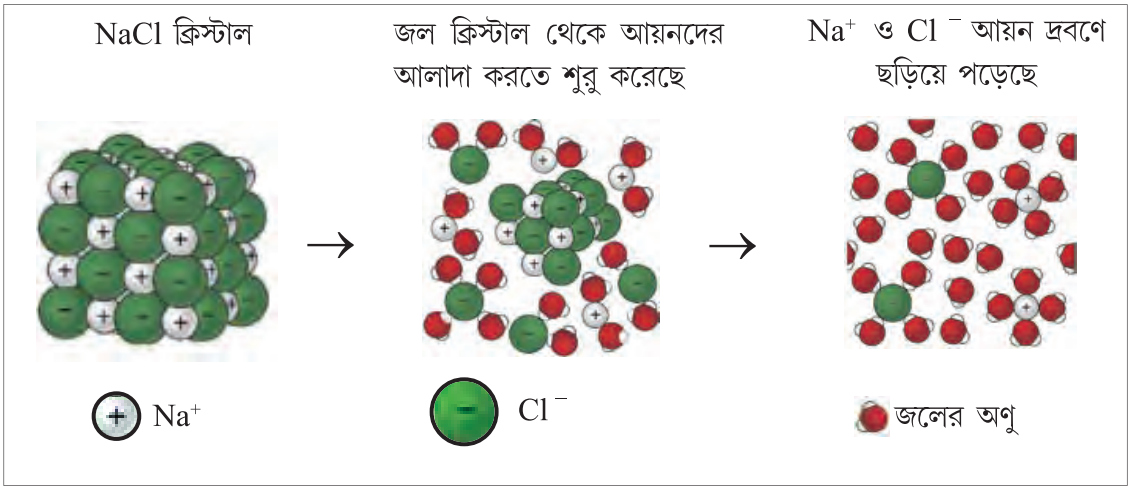

● যেসব যৌগ আয়ন দিয়ে গঠিত তারা বিভিন্ন জৈব দ্রাবকের (ইথার, বেঞ্জিন, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি) চেয়ে জলে বেশি দ্রাব্য। তাহলে বলো সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সোডিয়াম নাইট্রেট নিয়ে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে হলে তুমি উপরোক্ত দ্রাবকগুলোর কোনটা বেছে নেবে।

তড়িৎ: জলে একটু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তার মধ্যে ব্যাটারির সাহায্যে তড়িৎ পাঠালে দেখা যাবে দুটো তড়িৎ দ্বারেই বুদবুদ আকারে গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এর মধ্যে একটা গ্যাস হলো হাইড্রোজেন ও অন্যটা অক্সিজেন। এক্ষেত্রে জল বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে :

$$\underset{\text{তরল}}{2H_2O} \longrightarrow \underset{\text{গ্যাস}}{2H_2} + \underset{\text{গ্যাস}}{O_2}$$

এখানে তড়িৎ না পাঠালে কিন্তু গ্যাস তৈরি হয় না। এর মানে হলো তড়িতের শক্তিই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। তোমরা কিন্তু এই পরীক্ষা কখনোই বাড়ির ইলেকট্রিক লাইনের সঙ্গে তার যুক্ত করে করবে না, তা খুব বিপজ্জনক।

রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে তোমরা কখনও 'ইলেকট্রোপ্লেটিং'-এর কারখানা দেখেছ? এখানে তড়িৎকে কাজে লাগিয়ে রাসায়নিক পদ্ধতিতে লোহার তৈরি থালা, চামচ, বাটির ওপর নিকেলের সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়া হয়। নিকেলের আস্তরণ দেওয়ার ফলে জিনিসগুলোয় সহজে মরচে পড়ে না। আস্তরণ দেবার কাজটাও একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং সেখানেও বিক্রিয়া ঘটাতে তড়িৎশক্তি ব্যবহৃত হয়।